উপমহাদেশের
অতীত রাজনীতির
খণ্ড চিত্র

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

উপমহাদেশের
অতীত রাজনীতির
খণ্ড চিত্র

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা

প্রকাশক
আবুল আসাদ
চেয়ারম্যান, দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
৭৮ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উখরা, ১৪৩০
বৈশাখ, ১৪২০
এপ্রিল, ২০১৩

মুদ্রণ ঃ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : ষাট টাকা মাত্র

Upomohadesher Oteet Rajniteer Khando Chitro : Written by AKM Nazir Ahmad and Published by Abul Asad Chairman The Independent Study Forum 78 Outer Circular Road Moghbazar Dhaka-1217 1st Edition April 2013 Price Taka 60.00 only.

প্রারম্ভিক কথা

অতীত কথা বলে। মনের কান দিয়ে শুনতে হয় তার কথা। অতীত সম্পর্কে সম্যক অবগতি বর্তমান অবস্থার সঠিক মূল্যায়নের মূল্যবান উপকরণ। অতীত থেকে বর্তমানে পৌঁছতে আমাদেরকে কতোগুলো বাধার পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে, কোথায় কোথায় আমরা হোঁচট খেয়েছি, কিভাবে আবার উঠে দাঁড়িয়েছি- সেইসব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকলেই তো অমাদের বর্তমান অবস্থানের প্রাসংগিকতা হৃদয়ংগম করা সম্ভব। আর অতীত ও বর্তমানের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে আগামী দিনের পথ চলার সঠিক দিকনির্দেশিকা।

আমরা, এই উপমহাদেশের মুসলিমরা, রাজনীতির দীর্ঘ ও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে সামনে এগিয়েছি। পথপরিক্রমার বাঁকে বাঁকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। সেই শিক্ষাগুলো ভুলে গেলে পথের দিশা হারিয়ে ফেলে আমরা মুখ থুবড়ে পড়বো দুর্গতির গহ্বরে। অতীতের কিছু কথা আমাদের কিছুতেই ভুলে যাওয়া সমীচীন নয়। স্মৃতিতে ধরে রাখার লক্ষ্যে ন্যূনতম কিছু কথা, কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। সম্মানিত পাঠকপাঠিকাদের দু'আ চাই। আর চাই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অপার অনুগ্রহ।

–এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচিপত্র

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ॥ ৯-১০

ক) দিল্লীতে মুসলিম শাসন ॥ ৯
খ) গৌড় রাজ্যে মুসলিম শাসন ॥ ১০
গ) দিল্লীর শাসনমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ॥ ১০

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে ইংরেজশাসন ॥ ১১-২৩

❑ ১৭৫৭ সনে পলাশী প্রান্তরে বাংলা-বিহার-উড়িশার নাযিম সিরাজুদ্দৌলাহ খানের পরাজয় ॥ ১১
❑ ১৭৭৩ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদ্দৌলাহর 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি স্বাক্ষর ॥ ১১
❑ ১৭৯৮ সনে হায়দারাবাদের নিযাম কর্তৃক ইংরেজদের সাথে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি স্বাক্ষর ॥ ১১
❑ ১৭৯৯ সনে মহীশূরের স্বাধীন শাসক ফাতেহ্ আলী টিপু সুলতানের পরাজয় ॥ ১২
❑ ১৮০১ সনে পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী শিখরাষ্ট্র গঠন ॥ ১২
❑ ১৮৩১ সনে বালাকোটে ইসলামী মুজাহিদদের পরাজয় ॥ ১২
❑ ১৮৩১ সনে নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লার পতন ॥ ১৫
❑ ফারায়েযী আন্দোলন ॥ ১৭
❑ ১৮৪২ সনে সিন্‌ধের আমীর শাসিত রাজ্যগুলোর পতন ॥ ২০
❑ ১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রামের ব্যর্থতা ॥ ২০
❑ ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিচার প্রহসন ॥ ২২

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ॥ ২৪-৮৮

❑ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন ॥ ২৪
❑ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন ॥ ২৫
❑ সিমলা ডেপুটেশন ॥ ২৮

❑ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠন ॥ ৩০
❑ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে উন্নয়ন ॥ ৩৩
❑ ১৯১২ সনে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ॥ ৩৭
❑ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা ॥ ৩৯
❑ শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ॥ ৪২
❑ কংগ্রেস কর্তৃক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা ॥ ৪৪
❑ ‘একজাতি’ তত্ত্বে কংগ্রেসের অনড়তা ॥ ৪৫
❑ ১৯১৬ সনের লাখনৌ চুক্তি ॥ ৪৬
❑ শাইখুল হিন্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিকল্পনা ॥ ৪৭
❑ খিলাফাত কমিটির অসহযোগ আন্দোলন ॥ ৫০
❑ কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ॥ ৫১
❑ ১৯২৫ সনের শুদ্ধি আন্দোলন ॥ ৫৩
❑ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কর্তৃক ‘একজাতি’ তত্ত্ব সমর্থন ॥ ৫৪
❑ ১৯২৯ সনের নেহরু রিপোর্ট ॥ ৫৫
❑ ১৯২৯ সনের মি. জিন্নাহর ১৪ দফা ॥ ৫৬
❑ কংগ্রেস কর্তৃক ‘পূর্ণ স্বাধীনতার’ দাবি উত্থাপন ॥ ৫৭
❑ রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ॥ ৫৮
❑ কংগ্রেস কর্তৃক ‘সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে’র বিরোধিতা ॥ ৬০
❑ ১৯৩৭ সনের প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন ॥ ৬১
❑ মি. জিন্নাহর চিন্তাধারার পরিবর্তন ॥ ৬৪
❑ ‘একজাতি’ তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ ॥ ৬৫
❑ ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব ॥ ৬৭
❑ ১৯৪৬ সনের দিল্লী প্রস্তাব ॥ ৭০
❑ অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন ॥ ৭২
❑ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর অবদান ॥ ৭৪
❑ ১৯৪৬ সনের কেবিনেট মিশন প্ল্যান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ॥ ৭৮
❑ অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠন প্রয়াস ॥ ৮১
❑ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান ॥ ৮৩
❑ দি ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাক্ট ১৯৪৭ ॥ ৮৫
❑ ১৯৪৭ সনের বাউন্ডারি কমিশন ॥ ৮৬
❑ জম্মু-কাশমির পেলো না পাকিস্তান ॥ ৮৭

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে মুসলিম শাসন

ক) দিল্লীতে মুসলিম শাসন

☐ আফগানিস্তানের হিরাত ও গজনীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিলো ঘুররাজ্য।

☐ গজনীর সুলতান মাহমুদ ঘুররাজ্য দখল করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঘুর বংশীয়রা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে ঘুর রাজ্য উদ্ধার করে। আরো পরে গজনী রাজ্যও তাদের দখলে আসে।

☐ ঘুর রাজ্যের অধিপতি গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরীর ভাই শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজ্য দিল্লী-আজমীর অধিকারের জন্য অগ্রসর হন।

☐ খৃস্টীয় ১১৯১ সনে থানেশ্বরের চৌদ্দ মাইল দূরে তরাইন নামক যুদ্ধক্ষেত্রে দিল্লী-আজমীর রাজ্যের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বিরাজের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি দেশে ফিরে যান।

☐ খৃস্টীয় ১১৯২ সনে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী আরো শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে আবার আসেন উত্তর ভারতে। তরাইন প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হয়।

রাজা পৃথ্বিরাজ পরাজিত এবং নিহত হন।

আজমীরে মুসলিম শাসন কায়েম হয়।

☐ শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরী কুত্‌বুদ্দীন আইবেককে আজমীরের গভর্ণর নিযুক্ত করে গজনী ফিরে যান।

☐ খৃস্টীয় ১১৯৩ সনে কুত্‌বুদ্দীন আইবেক দিল্লী জয় করেন।

অতপর তিনি গোয়ালিয়র, আন্‌হিলওয়ার, কনৌজ প্রভৃতি রাজ্য জয় করে মুসলিম শাসন কায়েম করেন।

কালক্রমে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র মুসলিম শাসন কায়েম হয়।

☐ খৃস্টীয় ১১৯৩ সন থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত ৬৬৪ বছর দিল্লীতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

খ) গৌড় রাজ্যে মুসলিম শাসন

- উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশ এবং বিহারের দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত ছিলো গৌড় রাজ্য।
- খৃস্টীয় ১২০৩ সনে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী গৌড় রাজ্য জয় করেন।

  গৌড় রাজ্যের রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলিম সৈন্যদের মুকাবিলা করার সাহস করেননি।

  তিনি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।
- মুসলিম শাসিত গৌড়রাজ্য 'লাখনৌতি' নামে আখ্যায়িত হয়। কালক্রমে তা বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়।
- পরবর্তী কালে, লাখনৌতি রাজ্য 'বাঙালা' নামে পরিচিত হয়।
- 'বাঙালা' নামটিই পরিবর্তিত হয়ে 'বাংলা' হয়।
- খৃস্টীয় ১২০৩ সন থেকে ১৭৫৭ সন পর্যন্ত ৫৫৪ বছর বাঙালায় বা বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

গ) দিল্লীর শাসনমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন

কালক্রমে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার ভার দুর্বল শাসকদের হাতে পড়ে। এই সুযোগে বিভিন্ন 'শুবা'-র শুবাদারগণ (গভর্ণরগণ) স্বাধীন হয়ে যান।

ফলে উপমহাদেশে অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে ইংরেজশাসন

☐ ১৭৫৭ সনে পলাশী প্রান্তরে বাংলা-বিহার-উড়িশার নাযিম সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের পরাজয়

১২০৩ সনে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী বাঙালায় বা বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এই শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো পাঁচশত চুয়ান্ন বছর। অতপর ১৭৫৭ সনে পলাশী প্রান্তরে বাংলা-বিহার-উড়িশার নাযিম সিরাজুদ্দৌলা খান ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর অধিনায়ক রবার্ট ক্লাইভের মুখোমুখি হন। প্রধান সেনাপতিসহ বেশ কয়েকজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা খান পরাজিত হন। বাংলা-বিহার-উড়িশায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন।

☐ ১৭৭৩ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথে অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদ্দৌলাহ্র 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি স্বাক্ষর

স্বাধীন অযোধ্যার নওয়াব সুজাউদ্দৌলাহ্ ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অযোধ্যার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে ইংরেজগণ। এমনকি নওয়াবের দেশীয় সৈন্যদের সেনাপতিত্বও তুলে দেওয়া হয় একজন ইংরেজ অফিসারের হাতে। এইভাবে অযোধ্যায় কার্যত: প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন।

☐ ১৭৯৮ সনে হায়দারাবাদের নিযাম কর্তৃক ইংরেজদের সাথে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি স্বাক্ষর

১৭৯৮ সনে স্বাধীন হায়দারাবাদের নিযাম মীর কামারুদ্দীন নিযামুল মুলক ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর সাথে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এইভাবে হায়দারাবাদেও কার্যত: প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন।

❑ ১৭৯৯ সনে মহীশূরের স্বাধীন শাসক ফাতেহ্ আলী টিপু সুলতানের পরাজয়

মহীশূরের শাসক হায়দার আলী ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি ইংরেজদের সাথে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ইংরেজরা সুকৌশলে মহারাষ্ট্রের হিন্দু মারাঠাশক্তি ও হায়দারাবাদের নিযামকে তাদের সাথে নিতে সক্ষম হয়।

তিন শক্তি মিলে হায়দার আলীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে থাকে।

হায়দার আলী বীর বিক্রমে তাদের মুকাবিলা করে চলছিলেন।

১৭৮২ সনে হায়দার আলী মৃত্যুবরণ করেন।

মহীশূরের মসনদে বসেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ফাতেহ্ আলী টিপু সুলতান।

তিনিও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়ে যেতে থাকেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালে ১৭৯৯ সনে মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রণাংগনে টিপু সুলতান শহীদ হন। ফলে মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ শাসন।

❑ ১৮০১ সনে পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী শিখরাষ্ট্র গঠন

পাঞ্জাবে ছিলো অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য। ১৮০১ সনে রণজিৎ সিং খণ্ড রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী শিখরাষ্ট্র গঠন করেন। তিনি ক্রমশ তাঁর রাজ্য সীমা বাড়াতে থাকেন। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান নাম খাইবার-পাখতুনখোয়া) বিরাট অংশ এবং কাশমিরও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। লাদাখ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিলো লাহোর। দ্বিতীয় রাজধানী ছিলো পেশাওয়ার। শিখ সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনপদগুলোতে হামলা চালাতো, লুণ্ঠন করতো ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো। দারুণ অস্বস্তিতে বসবাস করতো মুসলিমগণ। উল্লেখ্য, রনজিৎ সিং ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলেন।

❑ ১৮৩১ সনে বালাকোটে ইসলামী মুজাহিদদের পরাজয়

দিল্লীর শাহ আবদুর রহীমের সন্তান ছিলেন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী।

আব্বার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করে তিনি আলকুরআন ও আস্ সুন্নাহর

জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ। আব্বার মৃত্যুর পর তিনি রহীমিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান হন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সাথে তিনি বহু সংখ্যক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীছের মাধ্যমে একদল মুত্তাকী ও মুহসিন ব্যক্তি গড়ে তোলার প্রয়াস চালাতে থাকেন।

১৭৬২ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর সুযোগ্য ছেলে শাহ আবদুল আযিয দেহলবী।

১৮১৮ সনে শাহ আবদুল আযিয দেহলবী তাঁর আব্বার চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে গঠন করেন 'তারিকা মুহাম্মাদিয়া' নামে একটি সংগঠন। তিনিও একদল খাঁটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্রতী হন।

শাহ্ আবদুল আযিয দেহলবী ঘোষণা করেন যে ইংরেজদের অধীনে ভারত দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে, অতএব একে মুক্ত করার জন্য জিহাদ প্রয়োজন।

১৮২৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। 'তারিকা মুহাম্মাদিয়া'র নেতৃত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর হাতে। তিনি উপমহাদেশের সর্বত্র সফর করে সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিদেরকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে থাকেন।

অতপর তিনি বেলুচিস্তান হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেন। সেখান থেকে গিরিপথ ধরে পৌঁছেন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত (খাইবার-পাখতুনখোয়া) প্রদেশে।

১৮২৭ সনের ১১ই জানুয়ারি সীমান্ত প্রদেশের (খাইবার-পাখতুনখোয়া) 'সামাহ' নামক স্থানে সমবেত আলিম, পাঠান সরদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীকে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করেন।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শারীয়াহ কার্যকর করার কাজে হাত দেন এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলেন একটি মুজাহিদ বাহিনী।

রণজিৎ সিং নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেননি। ফলে সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন রণাংগনে শিখদের মুকাবিলা করে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

একদিকে তিনি যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন শিখ সৈন্যদের বিরুদ্ধে। অপরদিকে ইয়ার মুহাম্মাদ খান, খাদি খান, পায়েন্দা খান, সুলতান মুহাম্মাদ খান, ফাতেহ খান, জবরদস্ত খান প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদারকে মুকাবিলা করে চলছিলেন।

১৮৩০ সনে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী শিখসেনাদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে পেশাওয়ার প্রবেশ করেন। কিন্তু যেইসব পাঠান সরদার ইসলামী শারীয়াহ মেনে নিতে পারেনি তারা নানা ধরনের চক্রান্ত চালাচ্ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী কুনহার নদীর তীরবর্তী কাগান উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বালাকোট নামক স্থানে এসে ছাউনী ফেলেন। এটি ছিলো ১৮৩১ সনের এপ্রিলের শেষ ভাগের ঘটনা।

শিখ রাষ্ট্রপ্রধান রণজিৎ সিং ইংরেজ অফিসার ও পেশাওয়ারে অবস্থিত তাঁর মিত্রদের সহযোগিতা নিয়েও সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী ও তাঁর সৈন্যদেরকে নির্মূল করতে পারছিলেন না।

অবশেষে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শের সিংকে ইসলামী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাঠান। সংগে পাঠান সরদার আত্তার সিং, সরদার শ্যাম সিং, সরদার প্রতাপ সিং, রতন সিং, সাধু সিং, সরদার ওয়াজির সিং, গুরমুখ সিং লাহনা, লাখমির সিং, মাহান সিং প্রমুখ সেনাপতিকে।

এক সর্বাত্মক যুদ্ধের বিশাল আয়োজন নিয়ে শিখ সেনারা এগিয়ে আসে। তারা কুনহার নদীর পূর্বতীরে অবস্থান গ্রহণ করে।

সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল (ইনি ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর অন্যতম পুত্র শাহ আবদুল গনি দেহলবীর একমাত্র ছেলে।), মোল্লা লাল মুহাম্মাদ, ওয়ালী মুহাম্মাদ, নাসির খান ও হাবীবুল্লাহ খানের সেনাপতিত্বে ছোট ছোট সেনাদল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করেন।

১৮৩১ সনের ৬ই মে শিখ সৈন্যরা কুনহার নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

তারা বালাকোট ও মাটিকোটের মধ্যবর্তী সমতল স্থানে এসে পৌঁছে। মুসলিম মুজাহিদগণ প্রান্তরে এগিয়ে গিয়ে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রথমে ইসলামী ফৌজ বিজয়ী হয়। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্বে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী আহত হন ও শত্রুদের হাতে পড়েন। তাঁর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে নেওয়া হয়। রণাংগনে তাঁকে দেখতে না পেয়ে মুসলিম বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তদুপরি সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর সুযোগ্য সেনাপতি শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈলও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

যুদ্ধে বহু মুজাহিদ প্রাণ হারান। শদীদদের মধ্যে বাংলাদেশেরও পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন। এই পাঁচ জনের একজন ছিলেন নোয়াখালির মাও. ইমামুদ্দিনের ভাই আলিমুদ্দিন।

প্রধান সেনাপতি শের সিং তাঁর সেনাবাহিনীর কয়েকজন মুসলিম সৈনিককে দিয়ে কুনহার নদীর তীরে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন। শের সিং পরদিন লাহোর চলে যান।

মাহান সিং ও লাখমির সিং কয়েক ব্যক্তিকে টাকার বিনিময়ে হায়ার করে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর লাশ কবর থেকে তুলে টুকরো টুকরো করে কুনহার নদীতে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেন।

'গেজেটিয়ার অব পেশাওয়ার ১৮৮৩-৮৪' উল্লেখ করে যে নদীর স্রোতের তোড়ে তাঁর দেহের কিছু অংশ নদীর কিনারায় উঠে আসে এবং অংশগুলো পল্লীকোট (Pallikot) নামক স্থানে দাফন করা হয়।

বালাকোট প্রান্তরে জিহাদে অংশ গ্রহণকারী পূর্ববাংলার মুজাহিদদের মধ্যে যাঁরা জীবিত থেকে দেশে ফিরেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাও. ইমামুদ্দিন (হাজীপুর, নোয়াখালি), সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (মলিয়াশ, মিরসরাই, চট্টগ্রাম) এবং মাও. আবদুল হাকিম সিদ্দিকী (চুনতি)।

(মাও. মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেযজী হুজুর)- এর দাদা মাও. আকরামুদ্দিন মিয়াজী (লক্ষীপুর) ছিলেন মাও. ইমামুদ্দিনের শিষ্য ও খালীফা।)

☐ ১৮৩১ সনে নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লার পতন

(১৭৮২ সনে সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার চাঁদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।)

১৮২৩ সনে সাইয়েদ নিসার আলী হাজে যান। সেখানে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর আলোচনা শুনে সাইয়েদ নিসার আলী বিপুলভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন।
১৮২৭ সনে তিনি দেশে ফিরেন।

(উপমহাদেশে ব্যাপক সফরের এক পর্যায়ে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী কলকাতা আসেন। কলকাতায় শামসুন্‌নিসা খানমের বাড়িতে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবীর সাথে একটি মিটিংয়ে মিলিত হন মাও. আবদুল বারী খান (মাও. আকরাম খাঁর পিতা), মাও. মুহাম্মাদ হুসাইন, হাজী শারীয়াতুল্লাহ, সুফী খোদাদাদ সিদ্দিকী, আলী জৌনপুরী, সাইয়েদ নিসার আলী এবং মাও. ইমামুদ্দিন। এই মিটিংয়ে ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।)
এই মিটিংয়ের পর গ্রামে ফিরে সাইয়েদ নিসার আলী ইসলামের আসল রূপ মুসলিমদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে থাকেন।
নদীয়া, ২৪ পরগনা ও পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত এলাকার বহু লোক তাঁর অনুসারী হয়।
তিনি সরফরাজপুর গ্রামের প্রাচীন শাহী মাসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাবলীগ ও দা'ওয়াতের কাজ করতে থাকেন।

পুরহা-র জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাংগার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগুনিয়ার জমিদার রাজনারায়ণ, নাগপুরের জমিদার গৌরীপ্রসাদ চৌধুরী এবং গোবরাগোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় মুসলিমদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁরা বিভিন্ন নামে ট্যাকস আরোপ করে মুসলিমদের ওপর যুল্‌ম করতেন।
তিতুমীর হিন্দু জমিদারদের আরোপিত মাসজিদ নির্মাণের ওপর ট্যাক্স, দাড়ি রাখার ওপর ট্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন যুলমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন।
তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করা হয়। তাঁদের ওপর বারবার সশস্ত্র হামলা চালানো হয়।
সরফরাজপুর থেকে সরে এসে তিনি নারকেলবেড়িয়া নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন।
জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের লোকেরা এসে মুসলিমদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে নেয়।

বারবার হামলার শিকার হচ্ছিলো মুসলিমগণ।

হামলা প্রতিহত করার লক্ষ্যে হাজার হাজার বাঁশ সংগ্রহ করে তিতুমীর নারকেলবেড়িয়ায় একটি কেল্লা গড়ে তোলেন।

১৮৩১ সনের ১৯শে নবেম্বর।

কৃষ্ণদেব রায় ইংরেজদেরকে তাঁর সাথে নিতে সক্ষম হন।

জমিদারের লোকদের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর কর্ণেল স্টুয়ার্ট একশত ঘোড় সওয়ার, তিনশত পদাতিক সৈন্য ও দুইটি কামানসহ এগিয়ে আসেন। ইংরেজদের কামান গর্জে উঠে। ভেংগে পড়ে নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহীদ হন তিতুমীর ও আরো অনেকে।

❑ ফারায়েযী আন্দোলন

১৭৮১ সনে হাজী শারীয়াতুল্লাহ মাদারীপুর জিলার বন্দরখোলা পরগনার শামাইল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

আট বছর বয়সে তিনি তাঁর আব্বা আবদুল জলিলকে হারান।

চাচা আজিমুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে তিনি পালিত হতে থাকেন।

গ্রামের শিক্ষালয়েই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতা যান।

সেখানে মাও. বাশারাত আলীর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা অর্জন করতে থাকেন।

১৭৯৯ সনে শারীয়াতুল্লাহ মাও. বাশারাত আলীর সাথে হাজে যান। তখন তিনি ১৮ বছরের তরুণ। অতো অল্প বয়সেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে হাজে যাওয়ার তাওফীক দান করেন।

শারীয়াতুল্লাহ ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু তরুণ। হাজের পর তিনি মাক্কা-মাদীনার বিভিন্ন শিক্ষাবিদের সান্নিধ্যে থেকে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও ব্যাপক জ্ঞান হাছিল করেন। তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের (রাহ) সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হন। ১৯ বছর মাক্কা-মাদীনায় অবস্থান করে জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে ১৮২০ সনে তিনি দেশে ফিরেন।

তখন চলছিলো দি ইংলিস ইস্ট কম্পেনীর শাসন। কম্পেনীর অধীনে

মধ্যস্বত্বভোগী বেশ কয়েকটি জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিলো বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা ছিলো গরীব মুসলিম। জমিদারদের ধার্যকৃত অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে তারা হিমসিম খাচ্ছিলো।

এই গরীব প্রজাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে জমিদারদের নজর ছিলো না। প্রজাদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিলো না। তদুপরি ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান না থাকার কারণে মুসলিমদের জীবনাচারে হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মুসলিমগণ। বিভিন্ন পূজা-পার্বনে হিন্দু জমিদারগণ মুসলিমদেরকে অর্থ যোগান দিতে বাধ্য করতেন। তাঁদের জমিদারিতে গরু যবাই করতে দিতেন না। দাঁড়ি রাখলে মুসলিমদের ওপর ট্যাকস ধার্য করা হতো।

হাজী শারীয়াতুল্লাহ এই দুরবস্থা থেকে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য সমাজসচেতন লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা চালাতে থাকেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর চিন্তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে।

১৮১৮ সনে হাজী শারীয়াতুল্লাহ মুসলিমদের চিন্তার বিশুদ্ধিসাধন এবং চারিত্রিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন শুরু করেন। এটিকেই বলা হয় ফারায়েযী আন্দোলন। 'ফারয' অনুশীলনের ওপর বিশেষ তাকিদ দেওয়া হতো বলে আন্দোলনটি এই নামে পরিচিত হয়।

হাজী শারীয়াতুল্লাহর আন্দোলন ছিলো শান্তিপূর্ন এবং মাসজিদ ভিত্তিক। তিনি বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মাসজিদে যেতেন। লোকদেরকে একত্রিত করে আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখতেন। তাঁর আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে একদল মানুষ তাঁর অনুসরণ শুরু করে।

হাজী শারীয়াতুল্লাহ মুসলিমদেরকে হিন্দুদের পূজা-পার্বনে অর্থদান করতে নিষেধ করেন। গরু যবাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন। দাঁড়ি রাখার ওপর আরোপিত ট্যাকসের বিরুদ্ধাচারণ করেন।

মুসলিমদের মাঝে একটি সংগঠিত শক্তির বিকাশ ঘটছে দেখে হিন্দু জমিদারগণ শংকিত হয়ে পড়েন।

১৯৩১ সনে পশ্চিম বাংলার বেশ কয়েকজন হিন্দু জমিদার যেই ভাবে সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীরের বিরুদ্ধে লেগেছিলেন, একই সনে একই

ভাবে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের হিন্দু জমিদারগণ হাজী শারীয়াতুল্লাহর বিরুদ্ধে লাগেন। ঐ সময় কলকাতা থেকে হিন্দুদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকাগুলোও হাজী শারীয়াতুল্লাহর শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে।

তিনি জোর করে হিন্দুদেরকে মুসলিম বানাচ্ছেন বলে মিথ্যা প্রচারনাও চালানো হয়।

জমিদারগণ ইংরেজদেরকে তাঁদের সাথে নিতে সক্ষম হন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করা হয়। একাধিকবার তিনি বন্দি হন। তাঁর অনুসারীগণ জোটবদ্ধ হয়ে নিপীড়নের মুকাবিলা করতে থাকে।

বৃহত্তর ফরিদপুর, বৃহত্তর বরিশাল, বৃহত্তর পাবনা, বৃহত্তর যশোর, বৃহত্তর খুলনা, বৃহত্তর নোয়াখালি, বৃহত্তর কুমিল্লা এবং বৃহত্তর ঢাকা জিলায় তাঁর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলন পরিচালনার সুবিধার্থে এক সময় হাজী শারীয়াতুল্লাহ ঢাকার নয়াবাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন।

১৮৩১ সনে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে নয়াবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি নয়াবাড়ি ছেড়ে তাঁর জন্মস্থান শামাইলে এসে বাস করতে থাকেন। এখান থেকে তিনি নদীপথে কুমিল্লা ও নোয়াখালি জিলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গিয়ে দীনের দাওয়াত পেশ করতেন। হাজী শারীয়াতুল্লাহ ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন এই দেশকে দারুল হারব গণ্য করতেন। এই জন্য তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ জুমু'আ নামায ও ঈদের নামায আদায় করতেন না। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত তাঁর অনুসারীগণ এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮৪০ সনে হাজী শারীয়াতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফারায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্যপুত্র মুহাম্মাদ মুহসিনুদ্দিন।

(উল্লেখ্য, দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর মতে ১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রামে হাজী শারীয়াতুল্লাহর অনুসারীদের সম্পৃক্ততা ছিলো।

১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহের পর ফারায়েযী আন্দোলনের নেতা মুহাম্মাদ মুহসিনুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়।

১৮৬২ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।)

❑ ১৮৪২ সনে সিন্ধের আমীর শাসিত রাজ্যগুলোর পতন

গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরার শাসনকালে চার্লস নেপিয়ার নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি সামরিক অভিযান চালিয়ে একের পর এক সিন্ধের আমীর শাসিত রাজ্যগুলো দখল করে প্রতিষ্ঠিত করেন ইংরেজ শাসন।

❑ ১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রামের ব্যর্থতা

অনেক আগেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভেংগে পড়েছিলো।

দিল্লী ও আশপাশের কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো মোগল সম্রাটের শাসন।

প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের সময় থেকেই সম্রাটের মর্যাদা একজন পেনশনধারী ব্যক্তির মর্যাদায় নেমে এসেছিলো। দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর কথামতোই তাঁকে ওঠবস করতে হতো।

গোটা উপমহাদেশে দেশীয় রাজ্য (Princely states) নামে অনেকগুলো রাজ্য গড়ে ওঠে। দেশীয় রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ ইংরেজদের সাথে আপোস করে ক্ষমতায় টিকে থাকতেই ব্যস্ত ছিলেন।

সামগ্রিকভাবে আমজনতা ইংরেজদেরকে ভালো চোখে দেখতো না।

ইংরেজগণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়। ভারতবাসী অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হতে থাকে। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন আগ্রাসনের শিকার হয়।

ক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে।

১৮৫৭ সনের প্রথমভাগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘটে এক মহাবিস্ফোরণ।

এটি ছিলো আসলে আযাদী সংগ্রাম।

ইংরেজরা এই সংগ্রামের নাম দিয়েছিলো সিপাহী বিদ্রোহ।

দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর গভর্ণর জেনারেল লর্ড চার্লস ক্যানিং এর আমলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

১৮৫৭ সনের কিছু আগে দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর অধীনে কর্মরত সিপাহিদেরকে দেওয়া হয়েছিলো রাইফেলের বিশেষ ধরনের টোটা। পানিতে ভিজে যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য এই টোটার গায়ে দেওয়া থাকতো চর্বির আবরণ। রাইফেলে ঢুকাবার আগে টোটার এই চর্বির আবরণ

দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। কথা ছড়িয়ে যায়, গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি এই টোটার আবরণ।

দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর সৈন্যদের মধ্যে যারা ছিলো হিন্দু ও মুসলিম তারা ধর্মীয় কারণে এই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে তাদের কয়েকজনকে শাস্তি দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সনের ২৯শে মার্চ বারাকপুর (পশ্চিমবঙ্গ) সেনাছাউনিতে বিদ্রোহের সূচনা হয়।

১৮৫৭ সনের ১০ই মে মিরাট (উত্তরপ্রদেশ) সেনানিবাসের হিন্দু ও মুসলিম সিপাহিরা অস্ত্রহাতে রাজপথে নেমে আসে। কয়েক দিনের মধ্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, আগ্রা এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত দেশীয় সৈনিকেরা রাজপথে নেমে আসে। তাদের সাথে যোগ দেয় অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

এক পর্যায়ে তারা দিল্লী দখল করে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে গোটা উপমহাদেশের সম্রাট ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সেনাপতি বখত খান, বুন্দেলখন্ডের মারাঠা অধ্যুষিত ঝাঁসি রাজ্যের রাণী লক্ষীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, কানপুরের তাঁতিয়া তোপি, জগদিসপুরের রাজপুত রাজা বাবু কুনওয়ার সিং, মারাঠা নেতা নানাসাহিব পেশওয়া, তুলসিপুরের রাণী ঈশ্বরীকুমার দেবী প্রমুখ তাঁদের অনুগত সৈনিকদেরকে নিয়ে রণাংগনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বালাকোটের মুজাহিদদের উত্তরসূরীগণও শামিল ছিলেন এই সংগ্রামে। খায়রাবাদের মাও. ফজলে হক, পাটনার শাহ আহমাদুল্লাহ এবং থানা ভবনের হাজী ইমদাদুল্লাহ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে অজয়গড়, আলওয়ার, ভরতপুর, ভূপাল, বিকানির, জয়পুর, হায়দারাবাদ, কাশমির, মারওয়ার, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেননি।

এই সংগ্রামের সফলতার ফলে উত্তরভারতে একটি মুসলিম শক্তির পুন: প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা পছন্দ করেননি পাঞ্জাবের শিখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ইংরেজদেরকে সাহায্য করার জন্য শক্তিশালী সেনাদল প্রেরন করেন। একই ভূমিকা পালন করেন নেপাল রাজ। পাঞ্জাবের শিখ সৈন্য ও নেপালের গুর্খা

সৈন্যরা ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা প্রত্যাশীদেরকে কাবু করে ফেলে।

ইংরেজগণ দিল্লী দখল করে সম্রাট ও তাঁর পরিবার সদস্যদেরকে খুঁজতে থাকে।

ইতোপূর্বে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর লালকেল্লা ছেড়ে চলে যান এবং পূর্ব দিল্লীতে অবস্থিত সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি সৌধে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতি উইলিয়াম হডসন সেখান থেকে বাহাদুর শাহ জাফরকে গ্রেফতার করেন।

২১শে সেপ্টেম্বর সম্রাটের দুই ছেলে মির্যা মোগল ও মির্যা খাজির সুলতান এবং নাতি মির্যা আবু বাকরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সম্রাটকে মিয়ানমারের রাজধানী রেংগুনে নির্বাসিত করা হয়।

(১৮৬২ সনে তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।)

বন্দি ২৮ হাজার সেনা ও সাতশত আলিমকে ফাঁসি দেয়া হয়।

ঢাকার লালবাগ ফোর্টের বন্দী সিপাহীদেরকে বাহাদুর শাহ পার্কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

(এই সময় ইংল্যান্ডের রাণী ছিলেন ভিকটোরিয়া। ১৮৫৮ সনে বৃটিশ পার্লামেন্ট The Government of India Act 1858 পাস করে। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী উপমহাদেশটিকে দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনীর হাত থেকে নিয়ে বৃটিশ রাজকীয় শাসনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড চার্লস ক্যানিং হন বৃটিশ রাজকীয় শাসনের প্রথম ভাইসরয়।)

উপমহাদেশে জেঁকে বসে ইংরেজ শাসন।

❑ ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিচার প্রহসন

১৮৩১ সনে বালাকোট প্রান্তরে ইসলামী মুজাহিদদের বিপর্যয়ের পর 'সিত্তানা'কে কেন্দ্র করে মাও. বিলায়াত আলী ও মাও. ইনায়াত আলী তৎপরতা চালাতে থাকেন।

১৮৫৭ সনের আযাদী সংগ্রামে তাঁদের উত্তরসূরীগণ ইংরেজবিরোধী জনমত সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

পাঞ্জাবের শিখ সৈন্য এবং নেপালের গুর্খা সৈন্যদের সাহায্যে আযাদী

সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া শক্তিগুলোকে পরাভূত করার পরই ইংরেজগণ বিশেষভাবে ইসলামী শক্তির মূলোৎপাটনে মনোযোগী হয়। খোঁজাখুঁজি করে বহু সংখ্যক ইসলামী ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

১৮৬৪ সনে অনুষ্ঠিত হয় আমবালা ট্রায়াল।

মহারাণীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে মাও. ইয়াহইয়া আলী, মুহাম্মাদ জাফর থানেশ্বরী এবং মুহাম্মাদ শফীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। পরে মৃত্যুদন্ড পরিবর্তন করে তাঁদেরকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

১৮৬৫ সনে অনুষ্ঠিত হয় পাটনা ট্রায়াল।

মহারাণীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে শাহ আহমাদুল্লাহ (পাটনা), ফজলে আলী এবং ফরহাত আলীকে বিভিন্ন মেয়াদে দন্ড দেওয়া হয়। শাহ আহমাদুল্লাহকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।

১৮৭০ সনে অনুষ্ঠিত হয় মালদহ ট্রায়াল।

মালদহ অঞ্চলে কর্মতৎপর বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব আমিরুদ্দিনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয় এবং তাঁকে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৭০ সনে অনুষ্ঠিত হয় রাজমহল ট্রায়াল।

রাজশাহী অঞ্চলে কর্মতৎপর ইসলামপুরের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ইবরাহীম মন্ডলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে আন্দামান দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এইভাবে বহু সংখ্যক ইসলামী ব্যক্তিত্ব বিচারের নামে প্রহসনের শিকার হন।

দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন

☐ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন

১৮৮৫ সনে গঠিত হয় দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার অ্যালেন অকটেভিয়ান হিউম বৃটিশ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে মত আদান-প্রদানের জন্য একটি প্ল্যাটফরমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

এই লক্ষ্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসহ অনেকের সাথে মত বিনিময় করেন। ভাইসরয় লর্ড ডাফেরিনের সম্মতি হাছিল করে তিনি 'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' গঠনের উদ্যোগ নেন। স্থির হয়, প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পুনাতে। কিন্তু পুনাতে কলেরা দেখা দেওয়ায় সম্মেলন স্থল হিসেবে বোম্বাইকে বেছে নেওয়া হয়। বোম্বাইতে অবস্থিত Gokuldas Tejpal Sanskrit College- এ ২৮ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাহাত্তর জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই থেকে ৩৭ জন এবং মাদ্রাজ থেকে ২২ জন প্রতিনিধি। বাংলা থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তিনজন বৃটিশ ছিলেন এই ৭২ জনের মধ্যে। এঁরা হচ্ছেন অ্যালেন অকটেভিয়ান হিউম, উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন ও জন জারডাইন। এই সম্মেলনে দুই জন মুসলিম প্রতিনিধিও ছিলেন।

আলোচনান্তে এই সংগঠনের নাম রাখা হয় 'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি।

জেনারেল সেক্রেটারি হন অ্যালেন অকটেভিয়ান হিউম।

দাদাভাই নওরোজি, দীন শ ওয়াচা, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাদে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলন অলংকৃত করেন।

স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান মুসলিমদেরকে সযত্নে কংগ্রেসের সংশ্রব এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেস দ্বারা মুসলিমদের কোন উপকার হবে না।

☐ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন

১৯০৫ সন।

প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার উন্নয়ন, আইনশৃংখলা সংরক্ষণ ও দ্রুততার সাথে প্রশাসনিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন করার প্রয়োজনে তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সনের ২০শে জুলাই 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠনের ঘোষণা দেন।

বর্তমান বাংলাদেশ ও আসাম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জিলা ও জলপাইগুড়ি জিলা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ঘোষণার পরপরই শুরু হয় প্রতিক্রিয়া।

১৯০৫ সনের ৭ই অগাস্ট।

কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতি কাসিমবাজারের জমিদার মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেন, 'নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। হিন্দুরা স্বদেশেই আগন্তুক হবে। এর সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভীত এবং স্বজাতীয়দের ভবিষ্যতের চিন্তায় মুহ্যমান।'[১]

১৯০৫ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের সন্তান লালমোহন ঘোষ। সভাপতির ভাষণে তিনি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৯০৫ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলকাতার বাগবাজারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বাংলার বিবাড়িয়া জিলার কংগ্রেসী নেতা ব্যারিস্টার আবদুর রসূল। সভাপতির ভাষণে তিনি নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ কার্যকর হওয়ার দিন।

ঐ দিন প্রত্যুষে কলকাতায় 'রাখি' বা 'রক্ষা বন্ধন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদীরা দিনের কার্যক্রম শুরু করেন। দিনটিকে তারা শোক দিবস

---

[১] উদ্ধৃত, ড. মাহফুজ পারভেজ, বঙ্গভংগ না বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০১০, পৃষ্ঠা- ২০৬

হিসেবে ঘোষণা করেন। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি দিনটিকে 'মহা দুর্যোগের দিন' বলে অভিহিত করেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে ঐদিন রান্না করা বা উনুন জ্বালানো নিষিদ্ধ হয়।

ঐদিন কলকাতার বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা আনন্দ মোহন বসু। রোগাক্রান্ত ছিলেন বিধায় তাঁকে হুইল চেয়ারে করে সভায় আনা হয়। সেই সভায় বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের শপথ গ্রহণ করা হয়।

সেই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ গাইলেন, 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী।'

১৯০৬ সনের ১৬ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার বরিশালে বেঙল ন্যাশনাল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। অশ্বিনী কুমার দত্ত ছিলেন সভার ব্যবস্থাপক। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার আবদুর রসূল। এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, নিশিকান্ত বসু, তারিনী কুমার গুপ্ত, মুকুন্দ দাস, লালমোহন ঘোষ প্রমুখ।

(১৮৭৫ সনে বংকিমচন্দ্র চ্যাটার্জি 'বন্দে মাতরম' গানটি রচনা করেন।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কলকাতায়। এই সম্মেলনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দে মাতরম' গানটির প্রথম আট লাইন সুর দিয়ে গেয়েছিলেন।)

বংগভংগ রদ আন্দোলনের সকল মিছিলের শ্লোগান ছিলো 'বন্দে মাতরম'। সভার শুরুতে গাওয়া হতো 'বন্দে মাতরম'। সভা শেষ করা হতো 'বন্দে মাতরম' গান গেয়ে।

উল্লেখ্য, বংকিমচন্দ্র চ্যাটাজি বাংলায় 'হিন্দু জাতীয়তাবাদে'র স্থপতি। তাঁর লেখা উপন্যাস 'আনন্দ মঠ' মুসলিমবিদ্বেষে পূর্ণ।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের সময়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন, 'ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি।

(উল্লেখ্য, রাখি বা রক্ষা বন্ধন একটি প্রাচীন হিন্দু প্রথা। সাধারণত শ্রাবন পূর্ণিমায় এই উৎসব পালন করা হয়। ভাইবোন এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ একে অপরের হাতের কবজিতে রঙিন সূতা বেঁধে দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহযোগিতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রথা নিয়ে

আসেন বৃহত্তর অংগনে। ১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর নব গঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের যাত্রা শুরুর দিনে কলকাতার উচ্চবর্ণ প্রতিবাদী হিন্দুগণ যেইসব কার্যক্রম পরিচালনা করেন তার একটি ছিলো রাখি বা রক্ষা বন্ধন। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয় রাখি বা রক্ষা বন্ধনের মাধ্যমে।)

কিছুসংখ্যক মুসলিম নেতাও নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেন।
এঁদের মধ্যে ছিলেন সিরাজগঞ্জের ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, চট্টগ্রামের মাও. মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কুমিল্লার কাজী রিয়াজউদ্দীন, ফরিদপুরের রাজা আনোয়ারউদ্দীন খান, টাংগাইলের ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, টাংগাইলের আবদুল হালিম গজনবী, খাজা সলিমুল্লাহর বৈমাত্রেয় ভাই খাজা আতিকুল্লাহ, বি বাড়িয়ার ব্যারিস্টার আবদুর রসূল প্রমুখ।
এঁদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক নতুন প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে সরে আসেন। যেমন, খাজা আতিকুল্লাহ, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম, জমিদার হুসসাম হায়দার চৌধুরী, বলিয়াদির জমিদার রাজিউদ্দিন, সিরাজগঞ্জের মাও. নজিবুর রহমান প্রমুখ।
হিন্দুদের মধ্য থেকেও পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সমর্থনে এগিয়ে আসেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি। বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের মুকাবিলা করার জন্য ১৯০৯ সনের ২১শে মার্চ গড়ে তোলা হয় ইমপেরিয়াল লীগ। প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, প্রমথ নাথ রায় এবং যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আলকুরআনের বাংলা অনুবাদকারী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নতুন প্রদেশের পক্ষে ছিলেন। তিনি সিলেটের বিপিন চন্দ্র পালের বংগভংগ রদ আন্দোলনে যোগদানকে দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করেন।
(উল্লেখ্য, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৫ সনে নারায়নগঞ্জ জিলার পাঁচদোনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন একেশ্বরবাদী ব্যক্তি ছিলেন।
১৯১০ সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।)
হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেন, 'সারা বাংলা,

উড়িশা, আসাম, এমনকি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিলো বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সবগুলো প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিলো। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিলো এ চারণভূমি হ্রাসকরণ। বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেওয়া।'[২]

১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর নতুন প্রদেশের কাজ শুরু হয়। প্রদেশের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন স্যার যোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার। তিনি কর্তব্য পালনের জন্য ঢাকায় এলে মুসলিমরা তাঁকে খোশআমদেদ জানায়।

ঐদিন ঢাকার নর্থব্রুক হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সমাবেশে খাজা সলিমুল্লাহ নতুন প্রদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

'বংগভংগ' অর্থাৎ নতুন প্রদেশ গঠনকে প্রতিবাদী হিন্দুগণ "মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব", "মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি নামে অভিহিত করতে থাকে।

'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'- এর অন্যতম বিশিষ্ট নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নতুন প্রদেশ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কটের দাবি তোলেন।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এই নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করে।

❑ সিমলা ডেপুটেশন

১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ অস্তিত্ব লাভ করে।

১৯০৫ সনের ১৮ই নবেম্বর লর্ড কার্জনের স্থলে ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড মিন্টো।

১৯০৬ সনের ২০ই জুলাই সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড জন মর্লি বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে শিগগিরই ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হবে।

১৮৯২ সনে প্রবর্তিত 'The Indian Councils Act 1892' মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী ছিলো।

---

২. ড. বি. আর. আম্বেদকর, পাকিস্তান অর পার্টিশান অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা- ১১

(উল্লেখ্য, দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দাবির প্রেক্ষিতে The Indian Councils Act 1892- তে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে ননঅফিসিয়াল সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়।

প্রাদেশিক পরিষদ এবং চেম্বার অব কমার্সকে কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়।

জমিদারগণ, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড এবং চেম্বার অব কমার্সগুলোকে প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিনিধি মনোনীত করার অধিকার দেওয়া হয়।

এই সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় মুসলিমদের উপস্থিতি ছিলো একেবারেই নগণ্য। ফলে এই অ্যাকট মুসলিমদেরকে একেবারেই কোনঠাসা করে ফেলে।)

এইদিকে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ বিলুপ্ত করার জন্য আন্দোলন চলছিলো। নতুন সংস্কার আবার মুসলিমদের জন্য নতুন কোন্ সমস্যা সৃষ্টি করে, তা নিয়ে মুসলিমগণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌ক তখন আলীগড় 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ'-এর সেক্রেটারি রূপে কর্তব্য পালন করছিলেন। তিনি চিঠিপত্র লেখালেখি করে লর্ড মিন্টোর সাথে মুসলিমদের একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলা থেকে মোট ৩৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় একটি প্রতিনিধি দল। দলের প্রধান নির্বাচিত হন তৃতীয় আগাখান (প্রকৃত নাম স্যার সুলতান মুহাম্মাদ শাহ্)। হাকিম মুহাম্মাদ আজমল খানও এই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পশ্চিম বাংলা থেকে পাঁচজন মুসলিম নেতা এই ডেলিগেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্ব বাংলা থেকে এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কেবল বগুড়ার নওয়াব খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী।

১৯০৬ সনের ১লা অকটোবর মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিমলাতে গিয়ে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন।

এটিকেই বলা হয় সিমলা ডেপুটেশন।

তৃতীয় আগাখান একটি দীর্ঘ বক্তব্য পাঠ করেন।

এই বক্তব্যের খসড়া তৈরি করেছিলেন সাইয়েদ আলী বিলগ্রামী।

দাবিনামায় প্রশাসন, বিচার সংস্থা ও সেনাবাহিনীতে বর্ধিতহারে মুসলিমদেরকে নেওয়া, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিকট বোর্ডে মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা, প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম সদস্য নেওয়া এবং মুসলিমদের জন্য একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

হিন্দুভারত মুসলিমদের এই ডেপুটেশন ভালো চোখে দেখেনি।

অমৃত বাজার পত্রিকা জোরেসোরে এই ডেপুটেশনের বিরোধিতা করে।

১৯০৯ সনে ঘোষিত The Indian Councils Act 1909 ('মর্লি-মিন্টো রিফর্মস এ্যাক্ট') থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো মুসলিমদের দাবিগুলোর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এই সংস্কার আইনের অধীনে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

শুধু তাই নয়, সংখ্যানুপাতের ভিত্তি ছাড়াও মুসলিমদের রাজনৈতিক গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে অধিক আসন তথা weightage দেওয়া হয়।[৩]

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস- এর সদস্যগণ মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

তাঁরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থারও কড়া সমালোচনা করতে থাকেন।

❑ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠন

এই উপমহাদেশে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র স্থপতি ছিলেন স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান।

তিনি বলতেন, ইংরেজ জাতি জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। তাদেরকে

---

৩. ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা- ৫১

এই দেশ থেকে তাড়ানো সহজ নয়। মুসলিমদের উচিত আগে জ্ঞানবিজ্ঞানে ইংরেজদের সমকক্ষ হওয়া।

এই চিন্তা নিয়েই তিনি ১৮৭৫ সনে উত্তর প্রদেশের আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেন।

(উল্লেখ্য, এই কলেজটিই ১৯২০ সনে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত হয়।)

১৮৮৬ সনে স্যার সাইয়েদ আহমাদ খানের উদ্যোগে গঠিত হয় All India Muhammedan Educational Conference. এক এক বছর এক এক শহরে এই সংস্থার একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। প্রধানত মুসলিমদের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেও অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হতো এই সম্মেলনে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠনের বিরোধিতা করায় দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের চোখ খুলে যায়।

ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহর বড়ো ছেলে ছিলেন খাজা সলিমুল্লাহ।

তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরি করতেন। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে মোমেনশাহীতে ব্যবসা কাজে নিয়োজিত হন।

১৯০১ সনে আব্বার মৃত্যুর পর তিনি হন ঢাকার নওয়াব।

১৯০৬ সনের ২৭ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয় All India Muhammedan Educational Conference -এর ২০তম অধিবেশন।

তখনও হিন্দুদের বৃহত্তর অংশ 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলো।

এজুকেশনাল কনফারেন্স –এর ২০তম অধিবেশনের মেজবান হলেন খাজা সলিমুল্লাহ।

শাহবাগ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলন।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কলা ভবন, চারুকলা ইনস্টিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিলো শাহবাগ গার্ডেন।)

দুই হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন গোটা উপমহাদেশ থেকে।

প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তৃতীয় আগা খান, নওয়াব ওয়াকারুল মুল্‌ক

বা ভিকারুল মুল্‌ক (প্রকৃত নাম মুশতাক হুসাইন জুবেরী, মিরাট, উত্তর প্রদেশ), নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌ক (প্রকৃত নাম সাইয়েদ মেহদী আলী, ইটাওয়া, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসাইন (পাতিয়ালা), হাকিম মুহাম্মাদ আজমল খান (দিল্লী), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার (রামপুর), খান বাহাদুর আলী মুহাম্মাদ খান (মাহমুদাবাদ), খান বাহাদুর আহমাদ মুহীউদ্দীন (মাদ্রাজ), খান বাহাদুর শেখ গোলাম ছাদিক (অমৃতসর), রাজা নওশাদ আলী খান (অযোধ্যা), ব্যারিস্টার নবীউল্লাহ (লাখনৌ), খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী (বগুড়া), খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী (কুমিল্লা), এইচ.এম. মালেক (নাগপুর), জাফর আলী খান (হায়দারাবাদ) প্রমুখ।

উল্লেখ্য, খাজা সলিমুল্লাহ যুবক ব্যারিস্টার মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে সম্মেলনের দাওয়াতপত্র পৌঁছাবার জন্য শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে বোম্বাই (বর্তমান নাম মুম্বাই) পাঠান।

মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তখন বোম্বাই হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

১৯০৬ সনেই তিনি দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এমতাবস্থায় এই সম্মেলনে যোগদান করা নীতিবিরুদ্ধ হবে বিবেচনা করে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

১৯০৬ সনের ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা সম্মেলন।

প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টে নবনিযুক্ত বিচারপতি নওয়াব শরফুদ্দীন।

৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক অধিবেশন।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নওয়াব ওয়াকারুল মুল্‌ক (বা ভিকারুল মুল্‌ক)।

'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসি' গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ।

প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন হাকিম মুহাম্মাদ আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার, জাফর আলী খান প্রমুখ।

আলোচনান্তে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

প্রেসিডেন্ট হন তৃতীয় আগা খান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হন খাজা সলিমুল্লাহ।

সেক্রেটারি হন নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌ক ও নওয়াব ওয়াকারুল মুল্‌ক।

মুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই শুরু হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের পথ চলা। পরবর্তীতে এই লক্ষ্য আরো সম্প্রসারিত হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ঃ

১. মুসলিমদের জন্য সরকারি চাকরি এবং পেশাগত সুযোগসুবিধা আদায়।
২. মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি আদায়।
৩. মুসলিমদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
৪. নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতের উপযোগী একটি স্বায়ত্বশাসন পদ্ধতি অর্জন।
৫. ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা।

❑ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে উন্নয়ন

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা ছিলো ৩ কোটি ১০ লাখ।

এর মধ্যে মুসলিম ছিলো ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দু ১ কোটি ২০ লাখ। অবশিষ্টরা খৃস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক।

নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হয় শিলং।

ঢাকার নওয়াব খাজা আবদুল গনী ঢাকা শহরের উত্তরপূর্বাংশে তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর জন্য একটি দৃষ্টিনন্দন বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন। নাম দেন দিলখুশা।

নতুন প্রদেশ গঠনের সময় ঢাকার নওয়াব ছিলেন খাজা আহসানউল্লাহর ছেলে খাজা সলিমুল্লাহ।

সুবিস্তৃত বাগানবাড়িটি দুইভাগ করে উত্তরভাগ নওয়াব নিজে রাখেন। দক্ষিণভাগ নামমাত্র মূল্যে সরকারকে ইজারা দেন। দিলখুশার এই দক্ষিণভাগেই লে. গভর্ণরের জন্য একটি ছিমছাম বাংলো তৈরি করা হয়। এটিই ছিলো পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্ণর হাউস। অতপর এক লাখ টাকা ব্যয় করে একটি ভবন নির্মান করা হয়।

এটিই বর্তমান বংগভবন।

১৯০৬ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি লে. গভর্ণর স্যার যোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার নব নির্মিত গভর্ণর হাউসে প্রবেশ করেন।

এই গভর্ণর হাউসে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদ বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হতো।

উল্লেখ্য, নবগঠিত প্রদেশে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ১৫ জন।

রমনা তখন বনবাদাড়ে পূর্ণ। এখানে গভর্ণর হাউস নির্মাণের উদ্যোগ নেন প্রথম লে. গভর্ণর স্যার যোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার।

রমনাতে নির্মিত হয় একটি সুন্দর ভবন।

উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এটি লে. গভর্ণরের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয় বলে মত দিলে ভবনটি ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজকে দিয়ে দেওয়া হয়।

পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিংটিই সেই ঐতিহাসিক ভবন।

রমনাতেই নির্মিত হয় নতুন প্রদেশের সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুরাতন ভবনটিই সেই সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং।

মিন্টোরোড ও সন্নিকটস্থ স্থানগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত হয় অনেকগুলো বাসভবন।

১৯০৬ সনের ২০শে অগাস্ট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গভর্ণর হাউস রূপে আরেকটি ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

১৯১১ সনে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের নতুন লে. গভর্ণর হয়ে আসেন স্যার চার্লস স্টুয়ার্ট বেইলি। নব নির্মিত ভবনটির ফারনিশিং তখনো শেষ হয়নি। এই দিকে নতুন প্রদেশ আদৌও টিকবে কিনা, সংশয় দেখা দেয়। এমতাবস্থায় লে. গভর্ণর বেইলি নতুন ভবনে না ওঠে দিলখুশায় অবস্থিত গভর্ণর হাউসেই অবস্থান করতে থাকেন। রমনায় নির্মিত সেই নতুন ভবনটিই বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের বাসভবন।

পূর্ব বাংলা ও আসাম ছিলো শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া একটি অঞ্চল।

সেই সময় কেবল কলকাতা শহরেই মানসম্মত কলেজ ছিলো ১৩টি। আর সমগ্র পূর্ব বাংলায় মানসম্মত কলেজ ছিলো মাত্র ৩টি। আসামে ১টি।

এই সময় পূর্ব বাংলায় সরকারি হাইস্কুল ছিলো ২৫টি, আর বেসরকারি হাইস্কুল ছিলো ১৮৬টি। পূর্ব বাংলায় মোট ৩টি গার্লস হাইস্কুল ছিলো। ঢাকায় ১টি, মোমেনশাহীতে ১টি ও কুমিল্লায় ১টি। সরকারি সাহায্যে পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিলো ৩২০টি, আর বেসরকারি অনুদানে পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিলো ১৩৮টি। শিক্ষার মান আশানুরূপ ছিলো না।

নতুন প্রদেশে কোন টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ছিলো না।

নতুন প্রদেশ গঠনের পর বিভিন্ন স্থানে নতুন কলেজ গড়ে ওঠে। নতুন হাইস্কুল স্থাপিত হয়। টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠে।

নতুন প্রদেশের সরকার ঢাকা কলেজ, রাজশাহী কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের উন্নয়নে মনোযোগ দেয়। নতুন নতুন ভবন নির্মিত হয়। শিক্ষকদের আবাসন সুবিধা দেওয়া হয়। ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মিত হয়।

১৯০৪ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঢাকা কলেজের গ্রন্থাগার হিসেবে কার্জন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯০৮ সনে এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। পুরাতন ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে কার্জন হলে স্থানান্তরিত হয় ঢাকা কলেজ। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্মিত হয় ঢাকা হল। কলেজের চারজন অধ্যাপকের জন্য ৪টি বাংলোও তৈরি করা হয়।

ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী কলেজে অধিক সংখ্যক বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

আসামের গৌয়াহাটি কটন কলেজকে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করা হয়।

মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির পরিমান বাড়ানো হয়। স্কুল-কলেজে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। মুসলিম শিক্ষক ও মুসলিম স্কুল পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

নতুন প্রদেশ মুসলিমদের জন্য শিক্ষা ও চাকরির দ্বার খুলে দেয়। মুসলিমগণ ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে।

ইতোপূর্বে স্কুল-কলেজের প্রায় সকল শিক্ষকই ছিলো হিন্দু। লে. গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলার মুসলিম শিক্ষকদের সংখ্যা ৩৩% বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। ব্যামফিল্ড ফুলারের পর লে. গভর্ণর হেয়ারও মুসলিমদের জন্য চাকরি সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখেন। এর ফলে ১৯১২ সনে এসে মুসলিম শিক্ষকদের সংখ্যা ১৪৬৫৬ জনে দাঁড়ায়। শিক্ষা বিভাগে মুসলিম শিক্ষা অফিসারের সংখ্যা ছিলো প্রায় শূন্য। মুসলিম শিক্ষা অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ১৯১২ সনে এসে মুসলিম শিক্ষা অফিসারের সংখ্যা ১১৪ জনে উন্নীত হয়।

নব গঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে কলেজিয়েট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিলো ১৬৯৮ জন যা ছয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৫৬০ জনে।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিলো ৬,৯৯,০৫১ জন। ছয় বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৩৬,৬৫৩ জনে দাঁড়ায়। ছয় বছরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১,১৩৯ জনে উন্নীত হয়।

প্রদেশের শুরুতে পূর্ব বাংলায় মাক্তাব সংখ্যা ছিলো ১২৯৯ টি। ছয় বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৪৮টিতে দাঁড়ায়। মাক্তাবের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০,১৮৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪,৭০৩ জনে উন্নীত হয়।

১৯১১-১২ সনে এসে মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল সংখ্যা ৮২টিতে পৌঁছে।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে সরকারি উচ্চ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২৩৫ জন ছিলো হিন্দু, আর ৪১ জন ছিলো মুসলিম।

সামগ্রিকভাবে সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের সংখ্যা ছয়ভাগের একভাগেরও কম ছিলো।

নতুন প্রদেশে চাকরিতে হিন্দু মুসলিম বৈষম্য দ্রুত কমে আসতে থাকে।

নতুন প্রদেশে নিজস্ব বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাটের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়।

রাজধানী ঢাকার আশেপাশে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে থাকে।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন ও সড়ক উন্নয়নের বিরাট পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।

বাণিজ্য পণ্যের আনা-নেওয়া নিরাপদ করার জন্য নৌপুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।

শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগের জন্য পুরাতন রাস্তাগুলো সংস্কার এবং নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পর এই অঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

এই উন্নয়নের গতি ও ব্যাপ্তি ছিলো বিস্ময়কর।

☐ ১৯১২ সনে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ মুসলিমদের রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে।

সামগ্রিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায় শুধু মুসলিমবিদ্বেষের কারণেই এই প্রদেশের বিলুপ্তির দাবিতে আন্দোলনে নামে।

একদিকে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে বিষোদগার চলছিলো। অন্য দিকে হিন্দু যুবকেরা 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' প্রভৃতি নামে গুপ্ত সংস্থা গড়ে তোলে।

যুবক কর্মীদের মধ্যে ছিলো বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখ।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ বিলুপ্তির দাবিতে জোরেসোরে চলছিলো রাজনৈতিক আন্দোলন। এরি পাশাপাশি শুরু হয় সশস্ত্র তৎপরতা। লক্ষ্য ছিলো, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকারকে বুঝানো যে প্রশাসন চালাতে হলে নতুন প্রদেশ বাতিল করতে হবে।

সারা দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড শুরু হয়।

পশ্চিম বংগের গভর্ণর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার এবং পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়।

কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য পাঠানো হয় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে।

১৯০৮ সনে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা চালানোর অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুর (মেদিনীপুরে জন্ম) ফাঁসি হয়।

প্রফুল্ল চাকী (বগুড়ায় জন্ম) পালিয়ে যায়। পরে ধৃত হবার প্রাক্কালে গুলি করে আত্মহত্যা করে।

প্রফুল্ল চাকীকে নন্দলাল নামক এক পুলিশম্যান ধরিয়ে দেয়। প্রফুল্ল চাকীর সহকর্মীরা তাকে হত্যা করে।

ভাইসরয়ের বাসায় পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর মেয়ের বিয়ের দিন ফুলের টবে বোমা পাওয়া যায়।

অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের একটি বাগানবাড়ি ছিলো কলকাতার মানিক তলায়। এখানে গড়ে ওঠে সশস্ত্র গ্রুপের একটি গোপন আস্তানা। জানাজানি হয়ে গেলে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখকে।

'অনুশীলন' সমিতি ও 'যুগান্তর' সমিতিতে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিলো না। সকল সদস্যই ছিলো হিন্দু এবং প্রচণ্ডভাবে মুসলিমবিদ্বেষী।

বংগভংগ রদ আন্দোলনে চরমপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

আন্দোলনে চরমপন্থীদের প্রাধান্য দেখে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

বংগভংগ রদ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে শুরু হয় 'স্বদেশী আন্দোলন'।

প্রচন্ড চাপ অনুভব করে বৃটিশ প্রশাসন।

১৯১০ সনের ৬ই মে ইংল্যান্ডের রাজা হন পঞ্চম জর্জ।

১৯১০ সনের ২৩শে নবেম্বর ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ উপমহাদেশ সফরে আসেন।

দিল্লীতে একটি বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়।

রাজা পঞ্চম জর্জ এই সমাবেশে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন।

তার একটি ছিলো 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের' বিলুপ্তি। উল্লাসে ফেটে পড়ে হিন্দুরা। দারুণভাবে বেদনাহত হয় মুসলিমগণ।

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ বিলুপ্তির পর ঢাকায় পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ একটি মিটিং করেন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাজা মুহাম্মাদ ইউসুফ জান। পঞ্চম জর্জের সিদ্ধান্তে মুসলিম জনগোষ্ঠী যে দারুণভাবে ব্যথিত তা এই মিটিংয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

মুসলিম লীগের এক সভায় খাজা সলিমুল্লাহ বলেন, 'যারা বেপরোয়া আন্দোলন চালিয়ে আইনশৃংখলার অবনতি ঘটালো, সরকার তাদের কাছে

বশ্যতা স্বীকার করলো। তারাই এটা করতে বাধ্য করেছে। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের কাছে বিভাগের সিদ্ধান্ত নাকচ করার অর্থ হচ্ছে, বংগ বিভাগের ফলে স্বায়ত্বশাসনের সুফলসমূহ ভোগের যেই চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা।'

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বলেন, 'বংগভংগ পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য আশার সম্ভার নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু রদ হওয়ার পর তার ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে।'

স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'সম্রাটের সিংহাসন ও তাঁর প্রতিনিধির প্রতি আমাদের যতোটা আনুগত্য ততোটাই আমরা ক্ষুব্ধ সম্রাটের ঘোষণায় যেই কাপুরুষোচিত পরিকল্পনা প্রকাশ পেলো তার প্রতি।'

উল্লেখ্য, ১৯১২ সনের ১লা এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ।

থমকে দাঁড়ায় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের উন্নয়ন।

❑ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা

নতুন প্রদেশ বিলুপ্তির ঘোষণায় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মানুষ ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়।

১৯১২ সনের ২৯শে জানুয়ারি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা আসেন। খাজা সলিমুল্লাহ, খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাত করেন। তারা পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ হওয়ায় এই এলাকায় যেই উন্নতি হয়েছিলো তার বিবরণ দেন এবং প্রদেশটি বিলুপ্ত হওয়ায় কী কী ক্ষতি হতে যাচ্ছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বিভিন্ন দাবিও উত্থাপন করেন। অন্যতম দাবি ছিলো ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁদের দাবির প্রতি সমর্থন জানান এবং যথাশীঘ্র ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে কথা দেন।

১৯১২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি এই মর্মে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরপরই প্রতিবাদ শুরু হয়।

১৯১২ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিডন স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ

সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি। ভাষণে তিনি বলেন, 'রাজ দম্পতির এই দেশে শুভাগমনের ফলে একটা অস্বস্তিকর ভাব বিদূরিত হয়েছিল, কিন্তু ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে প্রস্তাব লাট বাহাদুর করেছেন তা মানুষের মনে নতুন করে উদ্বেগের সঞ্চার করলো। ঢাকায় যদি একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহলে বঙ্গবিভাগের কুফল আবার পরিষ্কার রূপে দেখা দেবে। এর ফলে বাংলা সাহিত্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে। এটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। যদি সাহিত্য একক ও সর্বসাধারণের সম্পদ হিসেবে গড়ে না উঠে, তাহলে আমরা ঐক্যের আশা করতে পারি না।'

বিপিন চন্দ্র পাল বলেন, 'পূর্ব বাংলার মতো কৃষকপ্রধান এলাকায় যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ চরমরূপে কলঙ্কিত হবে।'

১৯১২ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি ডেপুটেশন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাত করে। ডেপুটেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাজা পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অম্বিকাচরণ মজুমদার, কিশোরী মোহন চৌধুরী, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এবং যাত্রামোহন সেন। তারা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন।

ড. রাসবিহারী বলেন, 'ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হবার দরকার নেই। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করা দরকার, কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো কৃষক এবং সে কারণে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে তারা কোন সুবিধা পাবে না।'

১৯১২ সনের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দুরা একটি জনসভা করে। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশুতোষ মুখার্জি, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদারও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

(উল্লেখ্য, আশুতোষ মুখার্জি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্‌সলার। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে থাকলেও পরে তিনি বেশ নমনীয় হন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ফরিদপুরের সন্তান। ১৯১৪ সন থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে থাকলেও ১৯২১ সনে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব রূপ লাভ করে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে ইতিহাস বিভাগের প্রধান হন। আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন হন। ১৯৩৭ সন থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্‌সলার ছিলেন।)

'হিন্দু নেতাগণ একে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে তাচ্ছিল্য করেছেন। অনেকে ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ও বলেছেন।'[৪]

অনেকে বলেন যে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে কেবল মুসলিমরা সুবিধা পাবে।

উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, 'এই কথা কোনক্রমেই বলা যায় না যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মুসলিমদের জন্য হবে।'

প্রকৃত পক্ষে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের দৃঢ় মনোভাবের ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কার্যক্রম এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯২০ সনের ১লা ডিসেম্বর ড. ফিলিপ যোসেফ হারটগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চান্‌সলার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম রেজিস্টার নিযুক্ত হন খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমাদ।

১৯২১ সনের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রথম বছর এর ছাত্র ছিলো মাত্র ১৯২ জন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সী বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত ভবনটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্যাম্পাস।

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে কার্জন হল বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কার্জন হলের বিপরীত দিকে গভর্ণর হাউস হিসেবে নির্মিত বর্তমান হাইকোর্টের পুরাতন ভবনে ঢাকা কলেজ স্থানান্তরিত করা হয়।

(উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দোতলায় কয়েকটি কক্ষ ছাত্রদের থাকার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ছাত্রাবাসের নাম দেওয়া হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম

---

[৪] ড. মো. মকসুদুর রহমান, বঙ্গভঙ্গ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, পৃষ্ঠা– ১৫৮

হল। এই হলে রেসিডেন্ট ছাত্র ছিলো ৭৫ জন। ইতিহাস বিভাগের রিডার এ. এফ. রহমান এই হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন। হাউস টিউটার ছিলেন ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ ও সহকারি লাইব্রেরিয়ান ফখরুদ্দিন আহমদ।

১৯২৫ সনে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু সংখ্যক ছাত্রকে স্থানান্তরিত করা হয় রমনা হাউসে। বর্তমান পররাষ্ট্র দফতর ভবনটিই সেই রমনা হাউস।

ছাত্র সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বর্ধমান হাউসে স্থানান্তরিত করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলে বর্ধমানের (পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত) মহারাজা বিজয় চাঁদ মাহ্‌তাব বঙ্গীয় আইন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকায় এলে যাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারেন সেই জন্য নির্মিত হয়েছিলো বর্ধমান হাউস।

বাংলা একাডেমী ভবনটিই সেই বর্ধমান হাউস।

১৯৩১ সনের ১১ই অগাস্ট বর্তমান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। এই হল নির্মাণে ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ও বগুড়ার খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী বড়ো রকমের অবদান রেখেছেন।)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবহেলিত, অনুন্নত পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের দ্বার খুলে দেয়। তাচ্ছিল্য করে যাকে বলা হতো ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

☐ শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

কলকাতা মহানগরীর উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিলো একটি বড়ো জমিদার পরিবার। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার কিছু পরগনা এবং পূর্ব বাংলার বৃহত্তর পাবনা জিলা, বৃহত্তর রাজশাহী জিলা এবং বৃহত্তর বগুড়া জিলার বেশ কয়েকটি পরগনা জুড়ে বিস্তৃত ছিলো ঠাকুর পরিবারের জমিদারি। উড়িশার (উডিশা) কিছু অংশ এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

জমিদারির ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং প্রজাদের ওপর ধার্যকৃত অর্থ আদায়ের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পূর্ব বাংলায় এসে একাধারে অনেকদিন অবস্থান করতে হতো। সেই জন্য তিনি কুষ্টিয়া জিলার কুমারখালি উপজিলার

শিলাইদহ নামক স্থানে একটি কুঠিবাড়ি নির্মাণ করেন। এই কুঠিবাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুবিস্তৃত জমিদারি তদারকির সুবিধার্থে সিরাজগঞ্জ জিলার শাহজাদপুর এবং নওগাঁ জিলার পাতিসর নামক স্থানে নির্মাণ করা হয় আরো দুইটি কুঠিবাড়ি।

(উল্লেখ্য, তখন কুষ্টিয়া জিলা নদীয়া জিলার, সিরাজগঞ্জ জিলা পাবনা জিলার এবং নওগাঁ জিলা রাজশাহী জিলার অংশ ছিলো।)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন পরবর্তী জমিদার। তিনি বুড়িয়ে গেলে ১৮৯০ সন থেকে তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি পরিচালনার কাজ শুরু করেন। এই কাজে পূর্ব বাংলায় এসে তিনি প্রধানত শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে ওঠতেন। তবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৈরি করা 'পদ্মা' নামের বজরাতে (house boat) থাকাটাই তাঁর বেশি পছন্দনীয় ছিলো।

১৯০১ সন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশিরভাগ সময় শিলাইদহ অবস্থান করেন।

১৯০৫ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমিদারি ভাগ হলে 'পাতিসর এস্টেট' পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পান 'শিলাইদহ এস্টেট'। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ এস্টেট ভাগ্যকুলের (মুনশীগঞ্জ জিলায় অবস্থিত) জমিদারের নিকট বিক্রয় করে দেন।

রায়পুরের জমিদার বাবু সিতিকান্ত সিনহা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলার বোলপুর শহরের নিকটবর্তী ভুবনডাংগা নামক স্থানটি গিফ্‌ট দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। স্থানটি ছিলো খুবই নিভৃত ও শান্তিময়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাম দেন শান্তিনিকেতন।

১৯০১ সনে ঠাকুর পরিবার শান্তিনিকেতনে একটি স্কুল স্থাপন করে। কিছুকাল পর এটি আশ্রম বিদ্যালয় এবং আরো পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়।

১৯২১ সনে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হয়।

উচ্চতর শিক্ষাদানের আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিশ্বভারতী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৮৫৭ সনের ২৪শে জানুয়ারি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলছিলো। আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তেমন একটা ছিলো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির অর্থ দিয়ে শান্তিনিকেতনে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন।

'বিশ্বভারতী'র প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৪১ সনের ৭ই অগাস্ট তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

(১৯৫১ সনের মে মাসে সরকার 'বিশ্বভারতীকে' একটি পূর্ণাংগ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রথম ভাইস চান্‌সলার নিযুক্ত হন।)

☐ কংগ্রেস কর্তৃক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা

১৯১৭ সনের ১২ই জুলাই ভারত সচিব হন মি. মন্টেগু। তখন ভারতে ভাইসরয় ছিলেন চেমসফোর্ড। উভয়ের চিন্তা সমন্বিত হওয়ায় ১৯১৯ সনে পাস হয় The Government of India Act 1919. মি. মন্টেগু ও চেমসফোর্ডের নামানুসারে এই আইনকে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন'ও বলা হয়।

এই আইনেরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা (Separate Electorate)।

এই আইনের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়াও শিখ, ভারতীয় খৃস্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রমুখ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ ও অধিকার লাভ করে।

এই আইনের মাধ্যমে বৃটিশভারতের প্রদেশগুলোতে সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সংসদীয় স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়।

এই আইন অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

১৯১৯ সনের আইন পাসের পর দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের চরমপন্থী

নেতাগণ বোম্বাইতে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে এই আইনের তীব্র সমালোচনা করেন।
বিশেষত ‘পৃথক নির্বাচন’ ব্যবস্থাকে তাঁরা মোটেই মেনে নিতে পারেননি।

❑ ‘একজাতি’ তত্ত্বে কংগ্রেসের অনড়তা

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদে’র প্ল্যাটফরম রূপে গড়ে উঠতে থাকে।
ব্যারিস্টার মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ১৯১৩ সনে মুসলিম লীগে যোগ দেন।
তবে তখনো তিনি দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য পদে ইস্তফা দেননি।
১৯১৬ সনে মি. জিন্নাহ সভাপতি হওয়ার পর মুসলিম লীগ দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠে।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেসের প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি ছিলেন ‘ভারতীয় জাতীয়তাবাদে’র কট্টরপন্থী ধারকদের একজন। তিনি মুসলিমদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মতে মুসলিমদেরকে আলাদা জাতি গণ্য করার অর্থ দাঁড়াবে এক জাতির ভেতরে আরেক জাতির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। তদুপরি তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। এক সময় দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রকে ঘৃণার চোখে দেখতো। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় কংগ্রেসের এক সময়ের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু সমাজতন্ত্রকে দলের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তা। তিনি ধর্মকর্মকে কু-সংস্কার মনে করতেন। তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন যে ইসলামী জীবনপদ্ধতি মানে হচ্ছে বিশেষ ধরনের পাজামা পরা, দাড়ি রাখা ও এক বিশেষ ধরনের লোটা (বদনা) বহন করা।
জওহরলাল নেহরু জানতেন যে মুসলিমরা তেমন সংগঠিত নয়। ‘মুসলিম গণসংযোগ’ কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে কংগ্রেসের ভেতরে ঢুকিয়ে

নেওয়া সম্ভব। তাই কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারাই এই কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিহারের ড. সাঈদ মাহমুদ নামকাওয়াস্তে মুসলিম ছিলেন। কার্যত তিনি ছিলেন ইসলামের কট্টর দুশমন। তিনি বলতেন যে ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা পরিচিত হওয়া উচিত নয়। দেশের নাম 'হিন্দুস্থান'। আর দেশের সবাই 'হিন্দী' আখ্যায়িত হওয়া উচিত। মুসলিমদের উচিত হিন্দী নাম গ্রহণ করা। এতে হিন্দু মুসলিমের পার্থক্য ঘুচে যাবে।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস মুসলিমদেরকে বোকা বানিয়ে দলে ভেড়াবার জন্য 'ইসলামিয়াত সেল' গঠন করে। এর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন ড. মুহাম্মাদ আশরাফ। তিনি প্রচার করতেন যে রাজনীতিতে ধর্মীয় বিষয় টেনে আনা পশ্চাদপদতার লক্ষণ। একটি প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে একজন হিন্দু হিন্দু থাকবে না, একজন মুসলিম মুসলিম থাকবে না। ব্যক্তিগত জীবনে তারা যেই কোন ধর্মে বিশ্বাস রাখতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্য জীবনে ধর্মমত নির্বিশেষে এক জাতির সদস্য হিসেবে আচরণ করবে। ড. মুহাম্মাদ আশরাফ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে বলতে থাকেন যে দুনিয়ার পরবর্তী দ্বন্দ্ব হবে বিত্তবানদের সাথে সর্বহারাদের। আর মুসলিমরা যেহেতু পিছিয়ে রয়েছে, একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাঝেই নিহিত রয়েছে তাদের মুক্তি।

❑ ১৯১৬ সনের লাখনৌ চুক্তি

প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিলো তখন।

এটি ছিলো ভারতের 'স্বায়ত্বশাসন' আদায়ের উপযুক্ত সময়।

ভারতের 'স্বায়ত্বশাসন' আদায়ের জন্য দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ একই বক্তব্য নিয়ে ময়দানে তৎপরতা চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

এই সময়েই ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস মুসলিমদের 'পৃথক নির্বাচনে'র দাবি মেনে নেয়।

১৯১৬ সনে লাখনৌতে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। স্বাক্ষরিত হয় একটি সমঝোতা চুক্তি।

এটিকেই 'লাখনৌ চুক্তি' বলা হয়।

এই চুক্তির মাধ্যমেই কংগ্রেসের কাছ থেকে মুসলিম লীগ তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি লাভ করে।

এতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত আসনগুলোর এক তৃতীয়াংশ আসন পাবে মুসলিমগণ।

প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম সদস্যগণ পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

যেইসব প্রদেশে মুসলিমগণ সংখ্যাগুরু সেইসব প্রদেশে তাদের আসন সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় কিছু কম হবে। আবার যেইসব প্রদেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু সেইসব প্রদেশে তাদের আসনসংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় কিছু বেশি হবে। আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিল পাস হবে না যদি সেই সম্প্রদায়ের তিনচতুর্থাংশ সদস্য এর বিরোধিতা করে। দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ মিলিতভাবে ভারতের 'স্বায়ত্বশাসন' দাবি জানাতে থাকবে। ইত্যাদি।

হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ সৃষ্টির একটি চমৎকার ভিত্ রচনা করেছিলো এই সমঝোতা চুক্তি।

☐ শাইখুল হিন্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিকল্পনা

১৮৫১ সনে ভারতের উত্তরপ্রদেশের বেরেলী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন মাহমুদুল হাসান।

তাঁর আব্বা মাও. মুহাম্মাদ যুলফিকার আলী এবং চাচা মাও. মুহাম্মাদ মাহতাব আলী উঁচু মাপের আলিম ছিলেন।

১৮৫৭ সনে যখন দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে তখন মাহমুদুল হাসানের বয়স ছিলো ছয় বছর। সেই সময় তিনি তাঁর আব্বার সাথে মিরাট শহরে অবস্থান করছিলেন।

প্রথম পর্বে তিনি তাঁর চাচা মাও. মাহতাব আলী এবং মাও. আবদুল লতিফ ও মাও. মুংগেরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৮৬৬ সনের ২১শে মে মাও. মুহাম্মাদ কাসিম নানোতাবী, মাও. রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী এবং হাজী সাইয়েদ আবিদ হুসাইনের প্রচেষ্টায় দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম।

মাও. যুলফিকার আলী তাঁর ছেলে মাহমুদুল হাসানকে দেওবন্দ পাঠান। মাহমুদুল হাসান দারুল উলুমের প্রথম ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি মাও. মুহাম্মাদ কাসিম নানোতাবীর তত্বাবধানে হাদীছ চর্চা করতে থাকেন।

১৮৭৩ সনে তিনি দারুল উলুমের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৭৪ সনে তিনি দারুল উলুমের একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার ইতিহাস তখন অনেকের মতো তাঁকেও ব্যথিত করে তুলতো। কি করে উপমহাদেশ থেকে বৃটিশদেরকে তাড়িয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, সেই চিন্তা প্রায়শই তাঁর মনোমাঝে উঁকি দিতো। আফগানিস্তানের আমীরকে দিয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানো যায় কিনা, সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

মাও. মাহমুদুল হাসান তাঁর ছাত্রদের সাথে মত বিনিময় করতে থাকেন। যাঁরা তাঁর চিন্তার সাথে একমত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাও. উবাইদুল্লাহ সিন্‌ধি এবং মাও. মুহাম্মাদ মিয়া মানছুর আনছারী।

(উল্লেখ্য, ১৮৮০ সনে মাও. মুহাম্মাদ কাসিম নানোতাবী মারা যান।)

১৯০১ সন থেকে আফগানিস্তানের আমীর হন হাবিবুল্লাহ খান।

১৯০৫ সনে আমীর হাবিবুল্লাহ খান ভারতের বৃটিশ সরকারের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন।

১৯০৭ সনে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ভারত সফর করেন।

১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে ছিলো বৃটেন ও ফ্রান্স, অন্য দিকে জার্মেনী ও তুর্কী (উসমানী খিলাফাত)।

তুর্কী সরকার আমীর হাবিবুল্লাহ খানকে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধে নামার আহবান জানান।

তিনি যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন।

এই আমীর হাবিবুল্লাহ খানকে বৃটিশদের বিরুদ্ধে নামানো দু:সাধ্য ব্যাপার ছিলো।

মাও. মাহমুদুল হাসান ছিলেন আশাবাদী মানুষ। তিনি তাঁর ছাত্র মাও. উবাইদুল্লাহ সিন্‌ধিকে আমীর হাবিবুল্লাহ খানের নিকট পাঠান।

মাও. মুহাম্মাদ মিয়া মানছুর আনছারীকে পাঠান উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ (বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়া) সেখান থেকে ভলান্টিয়ার রিক্রুট করার লক্ষ্যে।

মাও. মহামুদুল হাসান নিজে হিজায যান। সন্তর্পনে সাক্ষাত করেন তুর্কীর গভর্ণর গালিব পাশার সাথে। পাশা তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

তখন নেতৃবৃন্দের মাঝে যোগাযোগ হতো রেশমি রুমালে বিশেষ ধরনের কালি দ্বারা লিখিত চিঠির মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যক্রমে উবাইদুল্লাহ সিন্‌ধি কর্তৃক মাও. মাহমুদুল হাসান এবং ইরানে আবস্থিত আরেক নেতাকে লেখা রেশমি রুমাল চিঠি পাঞ্জাবের এক গোয়েন্দা অফিসারের হাতে পড়ে।

এই সূত্র ধরে অনুসন্ধান চলতে থাকে।

১৯১৬ সনে ইংরেজরা মাক্কা থেকে মাও. মাহমুদুল হাসানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

মাল্‌টা দ্বীপ ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাজধানী ভ্যালেটা। ঐ সময় মাল্‌টা দ্বীপ ছিলো ইংরেজদের দখলে। বন্দি মাও. মাহমুদুল হাসানকে মাল্‌টায় এনে কারাগারে রাখা হয়।

মাও. উবাইদুল্লাহ সিন্‌ধির কাবুল সফর সফল হয়। কিন্তু মাও. মাহমুদুল হাসান বন্দি হয়ে গেলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

১৯১৯ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি আমীর হাবিবুল্লাহ খান মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর ভাই নাছরুল্লাহ খান আমীর হন।

সপ্তাহ খানেক পর তাঁর ভাই আমানুল্লাহ খান নাছরুল্লাহ খানকে বন্দি করে নিজেই আমীর হন।

পারিবারিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত আফগান আমীরের পক্ষে ভারতের মুসলিমদের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব ছিলো না।

১৯১৯ সনে ভারতে খিলাফাত কমিটি তুর্কী খিলাফাত রক্ষার অন্দোলন শুরু করে।

১৯২০ সনে মাও. মাহমুদুল হাসান জেল থেকে মুক্ত হয়ে মাল্টা থেকে ভারতে ফিরেন।

দেশে ফিরেই তিনি খিলাফাত কমিটির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে খিলাফাত আন্দোলনে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই সময় কেন্দ্রীয় খিলাফাত কমিটি মাও. মাহমুদুল হাসানকে 'শাইখুল হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে।

মাও. মাহমুদুল হাসান মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানীর সাথে 'তাফসীরে উসমানী' লেখার কাজেও অংশ নেন।

১৯২০ সনের ৩০শে নবেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পক শাইখুল হিন্দ মাও. মাহমুদুল হাসান মৃত্যুবরণ করেন।

☐ খিলাফাত কমিটির অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৪ সনে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯১৮ সনে এর সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে উসমানী খিলাফাত জার্মেনীর সাথে মিলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জার্মেনী ও উসমানী খিলাফাত পরাজিত হয়। বিজয়ী দেশগুলো উসমানী খিলাফাতের ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এবং মিসর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই সময় ভারতের মুসলিমগণ উসমানী খিলাফাতের অখণ্ডতা রক্ষার দাবিতে ইংরেজদের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য খিলাফাত কমিটি গঠন করে খিলাফাত আন্দোলন নামে এক আন্দোলন শুরু করে।

১৯১৯ সনে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। খিলাফাত কমিটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন মাও. শাওকাত আলী। অল ইন্ডিয়া খিলাফাত কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মাও. মুহাম্মাদ আলী জাওহার, শেখ শাওকাত আলী সিদ্দিকী, ড. মুখতার আহমাদ আনছারী, ব্যারিস্টার জান মুহাম্মাদ জুনেজো, মাও. হাসরাত মোহানী, মাও. সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, মাও. আবুল কালাম আযাদ এবং হাকিম মুহাম্মাদ আজমল খান।

খিলাফাত কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন তরুণ ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

খিলাফাত কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় লাখনৌতে অবস্থিত ছিলো।

১৯২০ সনে 'খিলাফাত মেনিফেস্টো' প্রকাশিত হয়।

এই মেনিফেস্টোতে উসমানী খিলাফাত রক্ষার জন্য বৃটিশদের প্রতি আহ্বান এবং ভারতের মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানানো হয়।

১৯২০ সনের ১লা জুলাই মহাত্মা গান্ধি (প্রকৃত নাম মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধি) হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ভাইসরয়ের কাছে এক চরমপত্র পেশ করেন।

১৯২০ সনের ৩১শে অগাস্ট খিলাফাত কমিটি 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করে। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন করেন কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধি।

❑ কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে কলকাতায় দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেস- এর এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমরা যে একটা বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি তা অস্বীকার করে লাভ নেই।.... সত্য বটে, চরিত্র ও ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা বিপ্লব-বিরোধী। সত্য বটে, ধীরে চলাই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু একবার যখন আমরা অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করি তখন আমরা অতি শীঘ্র ও দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হই। জীবন্ত কোন কিছুই এর জীবিতকালে বিপ্লব সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারে না।'

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনেই মহাত্মা গান্ধি তাঁর পর্যায়ক্রমিক 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে'র পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। বিপুল ভোটাধিক্যে তা গৃহীত হয়।

১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেস সম্মেলনে 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের' প্রতি প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, নাগপুর সম্মেলনে ২২ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিলো–

১. বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্য ব্যবহার,
২. খেতাব ও পদবী বর্জন, অবৈতনিক পদসমূহ ত্যাগ এবং স্থানীয় পরিষদে সরকার মনোনীত আসনসমূহ থেকে পদত্যাগ,
৩. সরকারি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন,
৪. আইনজীবীদের আদালত বর্জন,
৫. রাষ্ট্র চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্জন,
৬. নতুন কাউন্সিলের নির্বাচন বর্জন এবং ভোটদানে ভোটারদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন,
৭. বিভিন্ন পেশাজীবী জনগণকে মেসোপটেমিয়ায় চাকুরিতে যোগদান না করতে উদ্বুদ্ধ করণ,
৮. পঞ্চায়েত গড়ে তোলা এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করণ,
৯. চরকায় সুতা কাটায় উৎসাহ দান,
১০. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং
১১. সকল প্রকার অস্পৃশ্যতা দূর করণ।

হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে। বহু খ্যাতনামা আইনজীবী আদালত বর্জন করেন। বিদেশী পণ্য বর্জন কার্যকর হয়। মাও. শাওকাত আলী, মুহাম্মাদ আলী জাওহার, ড. মুখতার আহমদ আনছারী, মাও. আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ মুসলিম নেতাও 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে'র পুরোভাগে ছিলেন।

১৯২০ সনে খিলাফাত কমিটি ও দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হয়।

মহাত্মা গান্ধি 'খিলাফাত' ও 'স্বরাজ' দাবিতে হিন্দু ও মুসলিমগণ একজোট হতে পেরেছে দেখে পুলকিত হন।

তবে 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা' ইসলামী মৌলবাদীদের সাথে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস– এর জোটবদ্ধতা পছন্দ করেনি। অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই জোটবদ্ধতার মাধ্যমে হিন্দু মৌলবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে এর প্রতি উৎসাহ দেখায়নি।

(উল্লেখ্য, ১৯১৫ সনে মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকার- এর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'। এই সংগঠনের বক্তব্য

ছিলো, ভারত একটি হিন্দুরাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে 'হিন্দুত্ব'-ই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংগঠন ঘোর মুসলিমবিদ্বেষী ছিলো। মহাত্মা গান্ধি মুসলিমদের প্রতি নমনীয় ছিলেন অভিযোগ এনে ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি নাথুরাম গড়্সে তাঁকে হত্যা করে। এই নাথুরাম গড়্সে ছিলো 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'র সদস্যদের একজন ।)

১৯২২ সনে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীরা সহিংস হয়ে ওঠে এবং একটি পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ চালিয়ে ২৩ জন পুলিশম্যানকে হত্যা করে। দেশের অন্যান্য স্থানেও এমনটি ঘটতে পারে ভেবে মহাত্মা গান্ধি 'অসহযোগ আন্দোলন' স্থগিত ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্তে খিলাফাত কমিটি খুবই নাখোশ হয়।

মি. জিন্নাহ গোড়া থেকেই অসহযোগ আন্দোলন বিরোধী ছিলেন।

১৯২৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি গোপাল কৃষ্ণ গোখ্লের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে তুমুল প্রতিবাদের মুখেও অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে মি. জিন্নাহ বলিষ্ঠভাবে বলেন যে অসহযোগ কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর।

১৯২৪ সনে ইসলামবিদ্বেষী মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কীর কর্ণধার রূপে আবির্ভূত হন। তিনি উসমানী খিলাফাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং তুর্কীকে একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

ভারতে খিলাফাত আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়।

নেতৃবৃন্দ বিভক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন ক্যাম্পে। সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী ও চৌধুরী আফজাল হক গঠন করেন 'মাজলিসে আহ্রার'। ড. মুখতার আহমদ আনছারী, মাও. আবুল কালাম আযাদ এবং হাকিম আজমল খান মহাত্মা গান্ধির সাথে কংগ্রেসেই থেকে যান। মাও. শাওকাত আলী ও মাও. মুহাম্মাদ আলী জাওহার অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

হিন্দু ও মুসলিমদের সম্পর্ক আবার তিক্ত হয়ে ওঠে।

❑ ১৯২৫ সনের শুদ্ধি আন্দোলন

মৌলবাদী হিন্দুদের একটি সংগঠন ছিলো 'আর্য সমাজ'। ১৮৭৫ সনের ৭ই এপ্রিল স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী এটি গঠন করেন। তিনি 'বেদ'–ভিত্তিক

একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এই সংগঠনের অন্যতম নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৫ সনে 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে একটি অভিযান শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো, উপমহাদেশের মুসলিমদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো হিন্দু। মুসলিম শাসকদের চাপে পড়ে তারা হিন্দুত্ব ত্যাগ করে মুসলিম হয়। এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই তাদের উচিত মুসলমানিত্ব ত্যাগ করে হিন্দুত্বে ফিরে আসা।

'শুদ্ধি আন্দোলন' ছিলো মুসলিমদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচারণায় উত্তেজিত হয়ে একজন মুসলিম যুবক ১৯২৬ সনে তাঁকে হত্যা করে। এতে গোটা উপমহাদেশে মুসলিম বিরোধী দাংগা সংঘটিত হয়। হিন্দু নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে, আল কুরআনের বিরুদ্ধে ও আল জিহাদ পরিভাষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন।

মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ নতুন আঙ্গিকে বিকাশ লাভ করে।

❑ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কর্তৃক 'একজাতি' তত্ত্ব সমর্থন

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ভারতের উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম সেরা ছাত্র ছিলেন।

এক পর্যায়ে এসে তিনি দিল্লীর আমিনিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক হন।

তিনি তীব্রভাবে আলিমদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯১৯ সনে তাঁরই উদ্যোগে ২৫ জন আলিম মিলিত হন দিল্লীতে। মাও. আবদুল বারী (ফারাংগী মহল, দিল্লী), মাও. আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ সাজ্জাদ, মাও. আহমাদ সাঈদ এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলাপ আলোচনার পর গঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।

মুফতী সাহেব আহবায়ক নির্বাচিত হন।

১৯১৯ সনেরই ২৮শে ডিসেম্বর সাইয়েদ মাহমুদ দাউদ গজনবীর আতিথেয়তায় পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে অনুষ্ঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন।

এই সম্মেলনে মাও. আবদুল বারী জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন।

কালক্রমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ একটি বড়ো সংগঠনে পরিণত হয়।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম

কাতারের সৈনিক ছিলেন। ইংরেজ সরকার বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

১৯২৬ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দই প্রথম ভারতের ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’র আওয়াজ তোলে।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ‘একজাতি’ তত্ত্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

এতে জমিয়ত সম্পর্কে ভারতের বহু সংখ্যক সচেতন মুসলিম আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব মাও. হুসাইন আহমাদ মাদানী ‘একজাতি’ তত্ত্বের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে থাকেন।

(উল্লেখ্য, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ জীবনের শেষভাগে এসে হিন্দু মুসলিম দাংগা প্রত্যক্ষ করে দারুণভাবে ব্যথিত হন এবং সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে যান।)

❑ ১৯২৯ সনের নেহরু রিপোর্ট

সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী নেতৃবৃন্দ চেষ্টা চালাতে থাকেন।

দফায় দফায় মিটিং হতে থাকে।

১৯২৪, ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনগুলোতে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই মর্মে প্রস্তাবও গ্রহণ করে।

এক পর্যায়ে ভারতের জন্য একটি ন্যায্য সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

এই কমিটির আহবায়ক নির্বাচিত হন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

সকলেই আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

সকলেই সকল সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি বিজ্ঞতাপূর্ণ রিপোর্ট পাওয়ার জন্য উদগ্রিব ছিলেন।

১৯২৯ সনে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এই রিপোর্টে বলা হয়, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয় চেতনা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

অতএব পৃথক নির্বাচন নয়, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিই প্রবর্তিত হবে।

এই রিপোর্টে বলা হয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন সংরক্ষণের ধারনাটি সাম্প্রদায়িকতার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের নামান্তর। তবে যেই সব প্রদেশে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু, কেবল সেইসব প্রদেশে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। অনুরূপভাবে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

রিপোর্টে বলা হয়, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিমদেরকে এক তৃতীয়াংশ নয়, এক চতুর্থাংশ আসন দেওয়া হবে।

সিন্ধকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আলাদা করার বিষয়টি আর্থিক সংগতি বিবেচনার শর্ত যুক্ত করে অনিশ্চিত করে ফেলা হয়।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে পূর্ণাংগ প্রদেশে পরিণত করার দাবিটিও এই রিপোর্টে উপেক্ষিত হয়।

বহু কাঠখড়ি পুড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির যেই ভিত্ রচনা করা হয়েছিলো লাখনৌ চুক্তির মাধ্যমে, নেহরু রিপোর্ট প্রচণ্ড আঘাত হেনে তা ধসিয়ে দেয়।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে।

☐ ১৯২৯ সনের মি. জিন্নাহর ১৪ দফা

নেহরু রিপোর্ট দারুণভাবে ব্যথিত করে মুসলিমদেরকে।

দৃঢ়চেতা মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

এই প্রেক্ষাপটে তিনি চৌদ্দ দফা দাবি সম্বলিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তাঁর বক্তব্য ছিলো খুবই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ।

তিনি বলেন, সকল প্রদেশকে অভিন্ন স্বায়ত্বশাসন ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে।

সকল আইন পরিষদ এবং স্থানীয় পরিষদগুলোতে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

কোন প্রদেশকেই তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে সংখ্যালঘুতে কিংবা সংখ্যাসাম্যে হ্রাস করা যাবে না।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার করতে হবে।

সিন্ধকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আলাদা করে নতুন প্রদেশ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্য থাকতে হবে।
মন্ত্রীপরিষদে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম নিতে হবে।
মুসলিমদেরকে ন্যায্যহারে সরকারি ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে হবে।
সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
যুক্ত নির্বাচন নয়, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ইত্যাদি।

☐ কংগ্রেস কর্তৃক 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবি উত্থাপন

১৯২৯ সনে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
লেবার পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু Absolute majority না পাওয়ায় লিবারেল পার্টিকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করেন, 'কয়েক বছর নয়, বরং কয়েক মাসের মধ্যে কমনওয়েলথ জাতিসমষ্টির মধ্যে আরেকটি ডোমিনিয়ন যুক্ত হবে, ডোমিনিয়ন হবে আরেকটি জাতির। এ ডোমিনিয়ন কমনওয়েলথের মধ্যে সমমর্যাদার আসন পাবে। আমি ভারতের কথাই বলছি।'[৫]
(উল্লেখ্য, বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রকে বলা হতো ডোমিনিয়ন।)
১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্মেলন।
এই সম্মেলনে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি উত্থাপন করে।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেস ১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ারি 'পূর্ণ স্বরাজ' দিবস পালনের আহবান জানায়। প্রত্যেক কংগ্রেসীর জন্য একটি শপথনামাও প্রকাশ করা হয়। উক্ত শপথনামায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়, "আমরা বিশ্বাস করি, ভারতকে অবশ্যই

---

[৫] ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা- ১০৭

বৃটিশদের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।”

১৯৩০ সনে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে।

বছরের মাঝামাঝি আইন অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সরকার এই আন্দোলন দমনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সারাদেশ থেকে হাজার হাজার কংগ্রেসী গ্রেফতার হয়।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করেনি।

☐ রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

গোটা ভারত জুড়ে যখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছিলো, তখন বৃটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক নেতাদেরকে লন্ডনে রাউন্ডটেবিল কনফারেন্সে যোগদানের আহবান জানায়।

প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন।

১৯৩০ সনের ১২ই নবেম্বর বসে রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স-এর প্রথম অধিবেশন।

সর্বমোট ৮৯ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ১৬ জন ছিলেন বৃটিশ সদস্য, ১৬ জন ছিলেন দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি, ৫৭ জন ছিলেন বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি।

মুসলিম প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, আগা খান, মুহাম্মাদ আলী জাওহার এবং স্যার মুহাম্মাদ শফী। হিন্দু প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, মি. শাস্ত্রী, জয়াকর, মি. ওয়াই. চিন্তামনি এবং আরো অনেকে। শিখ প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সমপূরাণ সিং। ভারতীয় খৃস্টান প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কে.টি. পাল। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি ছিলেন ড. বি.এস. মুনজে। হরিজনদের পক্ষে ছিলেন ড. বি.আর. আম্বেদকর।

উল্লেখ্য, দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স-এর প্রথম অধিবেশনে কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি।

১৯৩১ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর বসে রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স -এর দ্বিতীয় অধিবেশন।

প্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী প্রায় সকল প্রতিনিধিই এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে আরো অংশ নেন মহাত্মা গান্ধি, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল, ডা. এস.কে. দত্ত, জি.ডি. বিরলা, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার আলী ইমাম, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি যোগদান করায় এই অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। মহাত্মা গান্ধি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কংগ্রেস যেহেতু ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের প্রতিনিধিত্ব করে, সেহেতু একমাত্র এটাই সঠিকভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।' তিনি আরো বলেন, 'কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই কারণে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাই অধিবেশনে প্রকৃত প্রতিনিধি। অকংগ্রেসী ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেউই জনগণের পছন্দভাজন নয়। কারণ তাদেরকে মনোনীত করেছেন সরকার।'

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মহাত্মা গান্ধির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, 'আগত লোকেরা সকলেই জনমতের প্রতিনিধি, কারণ তাঁরা ভারতের সকল দলের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, তাঁরা হচ্ছেন দলগুলোর সভাপতি অথবা নির্বাচিত অন্যান্য নেতা।'[৬]

অধিবেশনে যোগদানকারী অকংগ্রেসী প্রতিনিধিগণ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে সমর্থন করেন এবং তাঁরা সকলে মিলে কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করেন।

সংখ্যালঘু বিষয়ক সাবকমিটির মিটিংয়ে বক্তৃতা কালে মহাত্মা গান্ধি বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সর্বসম্মত নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, গভীর দুঃখের সাথে আমি একথা ঘোষণা করছি।'

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সমস্যার কোন সমাধান হয়নি দেখে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের মনোভাব আরো কঠোর হয়ে ওঠে। তাঁরা একটি যুক্তবিবৃতির মাধ্যমে প্রধানত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখার জোর দাবি জানান।

---

৬. ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা– ১১০

১৯৩২ সনের ১৭ই নবেম্বর বসে রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স -এর তৃতীয় অধিবেশন।

এই সম্মেলনে প্রতিনিধি সংখ্যা ছিলো খুবই কম। প্রধানত দ্বিতীয় অধিবেশনের সাবকমিটি প্রণীত রিপোর্টগুলো নিয়েই আলোচনা হয়।

এই অধিবেশনেও দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেস যোগ দেয়নি।

❑ কংগ্রেস কর্তৃক 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে'র বিরোধিতা

১৯৩১ সনে অনুষ্ঠিত রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষভাগে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা তৈরি করতে ব্যর্থ হলে বৃটিশ সরকার নিজেই একটি ফর্মুলা প্রদান করতে বাধ্য হবে। রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কোন সমাধান উদ্ভাবন করতে পারেনি।

১৯৩২ সনের ১৬ই অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন নির্ধারিত করে দেয়। এই রোয়েদাদে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। এই রোয়েদাদ হরিজনদেরকে পৃথক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের জন্য পৃথক আসন বরাদ্দ করে। এই রোয়েদাদ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিমদেরকে কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা দান করে। এই রোয়েদাদ পাঞ্জাব প্রদেশে শিখদেরকে এবং বাংলা প্রদেশে ইউরোপীয়দেরকে তাদের জনসংখ্যার চেয়ে অধিক আসন বরাদ্দ করে। এই রোয়েদাদ সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে নারীদেরকে আসন প্রদানের ব্যবস্থা করে। ইত্যাদি।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এই রোয়েদাদের প্রচন্ড বিরোধিতা করে।

এই সংগঠনের মতে এই রোয়েদাদ হিন্দু ও শিখদের প্রতি অবিচার করেছে। হরিজনদেরকে পৃথক সংখ্যালঘু বলে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধি পুনাতে আমরণ অনশন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধির জীবন বাঁচাবার জন্য হরিজনদের নেতা ড. বি. আর. আম্বেদকর হরিজনদের দাবি

পরিত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধির সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। স্থির হয়, হরিজনদের জন্য কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকবে, তবে তারা হিন্দুদের ভোটেই নির্বাচিত হবে। এই চুক্তিই 'পুনাচুক্তি' নামে অভিহিত।

১৯৩৩ সনের নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলনে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

'যদিও এই সিদ্ধান্ত মুসলিম দাবির তুলনায় অপ্রতুল, তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মুসলমানরা এটা মেনে নিচ্ছে। তবে তাদের সমুদয় দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তারা চাপ দিয়ে যাবেই। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে যেভাবে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেভাবেই বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মুসলমানরা আইনানুগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে।'[৭]

❑ ১৯৩৭ সনের প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন

১৯৩৫ সনে বৃটিশ পার্লামেন্ট 'The Government of India Act 1935' পাস করে।

এই আইনে প্রথমবারের মতো All India Federation গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

ভারতকে এগারোটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়।

বার্মাকে (বর্তমান মায়ানমার) বিযুক্ত করা হয় ভারত থেকে।

Federal Legislature দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে বলে স্থির হয়।

উচ্চকক্ষটি The Council of State এবং নিম্নকক্ষটি The Federal Assembly নামে অভিহিত হবে।

The Council of State-এ অনধিক ২৬০ জন সদস্য থাকবেন।

The Council of State -এর ১৫৬ জন সদস্য হবেন প্রদেশগুলোর প্রতিনিধি। ১৫৬ জনের মধ্যে ১৪০ জন সদস্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, ৬ জন ভাইসরয় কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং ১০ জন

---

[৭] ড. ওয়াহিদুজ্জামান, Towards Pakistan, পৃষ্ঠা- ৭০

অপ্রাদেশিক ভিত্তিতে আসন পাবেন। আর The Council of State-এর ১০৪ জন সদস্য হবেন দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি।

The Federal Assembly -তে অনধিক ৩৭৫ জন সদস্য থাকবেন। এদের মধ্যে ২৫০ জন সদস্য প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। আর ১২৫ জন সদস্য দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসকদের দ্বারা মনোনীত হবেন। ২৫ টি আসনের মধ্যে ৩ আসন শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধি এবং ১টি আসন শ্রম সংস্থার প্রতিনিধির দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

The Federal Assembly-এর ২৫০- ৪ = ২৪৬ টি আসন প্রদেশগুলোর জন্য নিম্নরূপে বন্টন করা হয় :

মাদ্রাজ প্রদেশ – ৩৭ টি, বোম্বাই প্রদেশ – ৩০ টি, বাংলা প্রদেশ – ৩৭ টি, উত্তর প্রদেশ – ৩৭ টি, পাঞ্জাব প্রদেশ – ৩০ টি, সিন্ধ প্রদেশ – ০৫ টি, কুর্গ– ০১ টি, বিহার প্রদেশ – ৩০ টি, মধ্য প্রদেশ ও বেরার – ১৫ টি, আসাম প্রদেশ – ১০ টি, উ.প. সীমান্ত প্রদেশ – ০৫ টি, উড়িশা প্রদেশ – ০৫ টি, বেলুচিস্তান প্রদেশ – ০১ টি, দিল্লী –০২টি, আজমীর মিরওয়ারা – ০১ টি। মোট আসন – ২৪৬ টি।

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের (The Government of India Act 1935) কেবল প্রাদেশিক অংশটুকু কার্যকর করার জন্য ১৯৩৭ সনে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, বিহার প্রদেশ ও উড়িশা প্রদেশ– এই সাতটি প্রদেশে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সরকার গঠন করে।

বাংলা প্রদেশ, আসাম প্রদেশ, সিন্ধ প্রদেশ ও বেলুচিস্তান প্রদেশ – এই চারটি প্রদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ বিভিন্ন প্রদেশে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে মিলে সরকার গঠনের ইংগিত দিয়েছিলো। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁরা আইন পরিষদে মুসলিম লীগকে একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবে

দেখতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়ে নিতে। আর এটা মেনে নেওয়া অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলো একেবারেই অসম্ভব।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগেসের সভাপতি পন্ডিত জওহর লাল নেহরু বলেন, 'ভারতে শুধু দুইটি দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়: একটি হচ্ছে কংগ্রেস, অপরটি সরকার। অন্যান্য দলগুলো কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত।' মি. নেহরুর এই ঘোষণায় মুসলিমগণ দারুণভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়।

কংগ্রেস শাসিত সাতটি প্রদেশে কার্যত হিন্দুরাজ কায়েম হয়। এইগুলোতে বংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জী রচিত সংগীত 'বন্দে মাতরম' কার্যতঃ জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। সরকারী ভাষা হয় হিন্দী। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু বীরদের জীবনী স্থান পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে স্বরস্বতী পূজা। মুসলিম বীরদের নামধারী স্থানগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়। সরকারী চাকুরিতে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়ে যায়। নানা অজুহাতে মুসলিমদের ওপর হামলা চলতে থাকে। বিপুল সংখ্যক মুসলিম প্রাণ হারায়।

(১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়। ১৯৩৯ সনে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইংরেজরা মহাযুদ্ধে উপমহাদেশের লোকদের সহযোগিতা চায়। মহাত্মা গান্ধি জানতে চান যে যুদ্ধের পর এই দেশের স্বাধীনতা দেয়া হবে কিনা। বৃটিশ সরকার কোন সন্তোষজনক জওয়াব দেয়নি। ফলে মহাত্মা গান্ধির নির্দেশে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করে। আড়াই বছর পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সাতটি প্রদেশের মুসলিমরা। যেই দিন কংগ্রেস সরকারগুলো পদত্যাগ করে, মুসলিম লীগ সেই দিনটিকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করে।)

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিমদের প্রতি হিন্দুদের যেই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভংগি প্রকাশ পায় তাতে মুসলিমরা বুঝতে সক্ষম হয় যে ইংরেজরা কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিলে তাদেরকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। ভবিষ্যত বিপদের আশংকায় তারা ভীত-বিহবল হয়ে পড়ে।

❑ মি. জিন্নাহ্‌র চিন্তাধারার পরিবর্তন

মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ছিলেন শিয়া পরিবারের সন্তান।

তিনি ছিলেন পুরোপুরি ইংরেজি শিক্ষিত। ইসলাম সম্পর্কে তিনি স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

মাও. আশরাফ আলী থানবী এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটিকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সনের বিভিন্ন সময়ে তিনি মাও. জাফর আহ্‌মাদ উসমানী, মাও. মুরতাজা হাসান, মাও. আবদুল জাব্বার, মাও. আবদুল গনী, মাও. মুয়ায্‌যাম হুসাইন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী, মাও. শাব্বির আলী প্রমুখকে কখনো একাকী, কখনো গ্রুপভিত্তিক মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র নিকট পাঠাতেন। তাঁরা ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করতেন। ইসলাম যে একটি পূর্ণাংগ জীবনবিধান এই সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়। আর এই সময়টি থেকেই মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে থাকেন এবং তিনি বলা শুরু করেন, 'ইসলাম শুধু কতিপয় বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের নাম নয় বরং রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সকল ধরনের বিধি-বিধান সমষ্টির নামই ইসলাম। এই সবগুলো নিয়েই আমাদের চলতে হবে।'[৮]

ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার পর মি. জিন্নাহ্‌কে কেউ 'শিয়া' বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। একবার কোয়েটাতে একটি শিয়া প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা তাদের বক্তব্য পেশ করার পর তাঁর সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে বলে, 'আপনি তো আমাদের সম্প্রদায়ের লোক।' মি. জিন্নাহ্ দৃঢ়তার সাথে বলে ওঠেন, 'No, I am a Muslim.'

(উল্লেখ্য, ১৯১৩ সন থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ যুগপৎ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন।

মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য চেষ্টারত ছিলেন। সেই জন্য তাঁকে বলা হতো Ambassador of

---

[৮] জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা, পৃষ্ঠা- ১০৪

Hindu-Muslim Unity (হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত)। মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ চাচ্ছিলেন মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায় সাংবিধানিক গ্যারান্টি। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিমদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষায় সাংবিধানিক গ্যারান্টি দিতে রাজি ছিলেন না।

১৯৩৯ সনে এসে মি. জিন্নাহ নিশ্চিত হন যে মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের বিকল্প কোন পথ নেই।)

❑ 'একজাতি' তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ

১৯২৫ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 'আলজমিয়ত' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে। সম্পাদক নিযুক্ত হন ২২ বছর বয়েসী কলম সৈনিক সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী।

১৯২৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের 'একজাতি' তত্ব সমর্থন করলে সাইয়েদ মওদূদী আলজমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

১৯৩২ সনে তিনি হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত 'তারজুমানুল কুরআন' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

১৯৩৮ সনে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের শীর্ষনেতা মাও, হুসাইন আহমাদ মাদানীর 'মুত্তাহিদা কাউমিয়াত' শীর্ষক বই প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, হিন্দু মুসলিম মিলে একজাতি হওয়াতে এবং একত্রে কাজ করাতে কোন দোষ নেই। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য সংঘ বা সমিতি গঠন করে থাকি এবং তাতে শুধু অংশ গ্রহণ করি না বরং সদস্যপদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করে থাকি। শহর এলাকা, বিশেষ এলাকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জিলা বোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি এবং এই ধরনের শতশত সমিতি রয়েছে যা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গঠিত। এইসব সমিতিতে অংশ গ্রহণ করা এবং সেই জন্য পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে চেষ্টা করাকে কেউ নিষিদ্ধ বলে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরনের কোন সমিতি যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাতে অংশ গ্রহণ করা হারাম, ন্যায়পরায়ণতার খেলাফ, ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত হয়ে যায়।'

'একজাতি' তত্ত্বের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী মাসিক তারজুমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন।

তিনি বলেন, 'ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয়েছে, যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দীন অনুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আহবান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা এই আহবান গ্রহণ করবে, তারা এক জাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে, তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি। তার ব্যষ্টি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।'

'এই দুইটি জাতির বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই আব্বা-আম্মার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে একজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'

'জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে কিছু নেই। একই শহর একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।'

'বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগন্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙের গুরুত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে সবচে' উত্তম রঙ।'

'ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে হৃদয়ের ভাষাহীন কথার।'

'ইসলামী জাতীয়তাবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" বন্ধুতা আর শত্রুতা এই কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে

থাকে। এই স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র ও কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।'

'উল্লেখ্য, অমুসলিম জাতিগুলোর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দুইটি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হিসেবে মুসলিম অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, ঔদার্য ও সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। কারণ মানবতার নিরিখে এইরূপ ব্যবহারই তাদের প্রাপ্য। এমন কি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি ও মিলিত উদ্দেশ্যের (Common cause) জন্য সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'একজাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।'

এইভাবে সাইয়েদ মওদূদী 'একজাতি' তত্ত্বের অসারতা উন্মোচিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সাইয়েদ মওদূদীর লেখাগুলো বিপুল সংখ্যায় বিলি করে কংগ্রেসের 'একজাতি' তত্ত্বের মুকাবিলা করতে থাকে।

❑ ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব

১৯৩০ সনের ২৯শে ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন মুসলিম লীগের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মাদ ইকবাল। সভাপতির ভাষণে ড. মুহাম্মাদ ইকবাল ভারতের মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

১৯৩৩ সনের ২৮শে জানুয়ারি চৌধুরি রহমত আলী "Now or Never, Are We to Live or Perish Forever?" শীর্ষক একটি প্রচারপত্রে 'পাকিস্তান' নামে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন। তিনি ভেবেছিলেন, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, কাশমির, পাঞ্জাব ও

সিন্ধ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হতে পারে। তিনি অবশ্য বাংলা প্রদেশকে পাকিস্তানের মধ্যে টেনে আনেননি; কারণ তাঁর মতে বাংলা প্রদেশ নিজেই একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেন, হায়দারাবাদ-দাক্ষিণাত্য এলাকায় অপর একটি মুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে যার নাম তিনি দিতে চেয়েছিলেন 'উসমানিস্তান'। এই ভাবে চৌধুরী রহমত আলী ভারতবর্ষে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের কল্পনা করেন এবং এই গুলোর একটি জোটের ওপর জোর দেন।[৯]

১৯৪০ সনের ২২ ও ২৩শে মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলন। এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ বলেন, 'এই কথা বুঝা কঠিন যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কেন বুঝতে পারেন না। আসলে এই দুইটি কোন ধর্ম নয় বরং দুইটি পৃথক ও সুস্পষ্ট সমাজ ব্যবস্থা এবং হিন্দু ও মুসলিমকে মিলিত করে একই জাতীয়তা গঠন একটা কল্পনাবিলাস মাত্র। এক জাতীয়তাবাদের ভুল ধারনাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হবে।

হিন্দু ও মুসলিমদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্য সম্ভার রয়েছে। তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করে না। তারা দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী যা দুইটি বিপরীত ধারনাবিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভংগিও আলাদা।

এই কথাও সত্য যে হিন্দু ও মুসলিম ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং প্রাসংগিক উপাদান, ঘটনাপঞ্জী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের জাতীয় বীর অন্যজনের শত্রু। এই ধরণের বিপরীতমুখী দুইটি জাতিকে –যাদের একটি সংখ্যাগুরু ও অপরটি সংখ্যালঘু– একই রাষ্ট্রে যুক্ত করে দিলে অশান্তি বাড়তে থাকবে এবং এমন রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্য

---

[৯] ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা– ১৬৫

যেই কাঠামোই তৈরি হবে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। জাতির যেই কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলিমরা একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল ও একটি রাষ্ট্র।'[১০]

সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে অর্থাৎ ২৩শে মার্চ ভারতের দশ কোটি মুসলিমের স্বকীয় জীবনধারা স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি কায়েমের দাবিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে প্রস্তাবটি পাঠ করেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অন্যতম জাঁদরেল নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। এই প্রস্তাবই ইতিহাসে 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

প্রস্তাবটি নিম্নরূপ :

"That it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles. viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as on the North Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign."

"That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where Musalmans are in minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution, for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them."[১১]

---

১০. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা– ৪২২, ৪২৩

১১. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে ৭৫, পৃষ্ঠা– ২

'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর কিংবা মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদি না অতপর বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে তা পরিকল্পিত হয়। যথা, ভৌগলিক নৈকট্য সমন্বিত ইউনিটগুলো প্রয়োজন অনুসারে স্থানিক রদবদলপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।'

'ইউনিট ও অঞ্চলগুলোতে সংখ্যালঘুদের সাথে পরামর্শ করে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে এবং ভারতের যেই সকল অংশে মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে।'

❑ ১৯৪৬ সনের দিল্লী প্রস্তাব

১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসে Federal Assembly-র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য রিজার্ভড ৩০টি আসনের মধ্যে ৩০টিতেই বিজয়ী হয়।

১৯৪৬ সনের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয় ১১টি প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন।

এই নির্বাচনেও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোতে মুসলিমদের জন্য রিজার্ভড আসনগুলোর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ আসনে বিজয়ী হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে আসামে ৩৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩১টি, বাঙালায় ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩টি, বিহার প্রদেশে ৪০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩৪টি, উড়িশা প্রদেশে ৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে

৪টি, উত্তর প্রদেশে ৬৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৫৫টি, পাঞ্জাব প্রদেশে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১৭টি, সিন্ধ প্রদেশে ৩৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২৮টি, বোম্বাই প্রদেশে ৩০টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৩০টি, মধ্য প্রদেশে ১৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১৪টি, মাদ্রাজ প্রদেশে ২৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২৯টি অর্থাৎ মোট ৫২৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪৬৪টি আসন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ লাভ করে।

এতে প্রমাণিত হয় সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতের মুসলিমগণ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত এবং 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি তাদের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন।

সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর মুসলিম লীগের একচ্ছত্র নেতা মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ৭, ৮ ও ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৬ তারিখে দিল্লীতে 'এ্যাংলো এরাবিক কলেজে' মুসলিম লীগ লেজিসলেটারস কনভেনশন আহবান করেন। 'লেজিসলেটারস কনভেনশনে'র শেষ দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক পঠিত নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

Resolved

(1) That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the North-West of India, namely Pakistan zones, where Muslims are in dominant majority, be constituted into a sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay;" [১২]

'ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বে বেঙল ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলগুলি যেগুলো পাকিস্তান জোন নামে অভিহিত এবং যেখানে মুসলিমরা প্রধান সংখ্যাগুরু তাদের সমবায়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং

---

১২. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৭ থেকে ৭৫, পৃষ্ঠা– ৭,৮

অবিলম্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কার্যকর করার নিমিত্ত দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক।'

(লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৪০ সনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে ছিলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন' এবং ১৯৪৬ সনের দিল্লী প্রস্তাবে ছিলো 'একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন'- এর কথা।

উপমহাদেশের মুসলিম প্রধান উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে মুসলিম প্রধান পূর্ব অঞ্চলের দূরত্ব ছিলো প্রায় দেড় হাজার মাইল। এমতাবস্থায় ১৯৪০ সনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে একটি এবং পূর্ব অঞ্চলে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করাই ছিলো বাস্তবতার দাবি। সম্ভবত উপমহাদেশের তখনকার মুসলিমদের ইসলামী চেতনাসিক্ত দুর্ভেদ্য ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ১৯৪৬ সনে গৃহীত দিল্লী প্রস্তাবে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন'-এর স্থলে 'একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন'-এর কথা সন্নিবেশিত করেন।

তবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশভাগ হলে ১৯৪৭ সনেই মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে পাকিস্তান এবং পূর্ব অঞ্চলে পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হতো।)

☐ অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন

১৯৩৬ সনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন।

১৯৩৭ সনে একদল মুসলিম ছাত্র হিন্দুপ্রধান অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসে। মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও ড. মুহাম্মাদ ইকবালের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা গঠন করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন।

এর প্রথম সভাপতি হন মুহাম্মাদ নু'মান এবং প্রথম সেক্রেটারি হন মুহাম্মাদ ওয়াসিক।

এই ফেডারেশনের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান মেহমান ছিলেন মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ।

এই ফেডারেশন কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বিদ্যামন্দির স্কিম' নামে বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানায়।

১৯৩৮ সনের ৬ই মে ইসলামিয়া কলেজ, লাহোরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অল

ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটি বংকিমচন্দ্র চ্যাটার্জি রচিত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক সংগীত 'বন্দে মাতরম' গাওয়া পরিত্যাগ করার আহবান জানায়।

১৯৩৯ সনে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাহমুদাবাদের রাজা ইয়াসিন খান অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেক্রেটারি হন ফজলুল কদের চৌধুরী।

১৯৪০ সনে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনে যোগদান করেন।

১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোর সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কর্তৃক মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবিতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করে। অতপর বাংলায় গঠিত হয় অল বেঙল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ। প্রেসিডেন্ট হন শামসুল হুদা চৌধুরী। সেক্রেটারি হন শাহ আজিজুর রহমান। ওই সময় ঢাকায় প্রধান ছাত্রনেতা ছিলেন নাজির আহমদ।

(উল্লেখ্য, নাজির আহমদ ছিলেন ফেনী জিলার দাগনভূঁইয়া উপজিলার আলীপুর গ্রামের সন্তান।

১৯৩৯ সনে ফেনী কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। থাকতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে।

অল বেঙল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের ঢাকা শাখার তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব।

১৯৪২ সনে সিরাজগঞ্জে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এই সম্মেলনে এসেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের নেতা নাজির আহমদ একদল ছাত্র নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দেন।

তখন জোরেসোরে চলছিলো পাকিস্তান আন্দোলন। নাজির আহমদ ঢাকা থেকে 'পাকিস্তান' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। তিনি নিজেই এর সম্পাদনা করতেন।

১৯৪৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ইসলামের আত্ তাওহীদ দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো বিধায় মুসলিম ছাত্ররা এটি গাইতো না। হিন্দু

মুসলিমদের যৌথ সম্মেলনে এটি গাওয়া হলে মুসলিম ছাত্ররা প্রতিবাদী হয়ে ওঠতো।

১৯৪৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্ররা একটি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র আহত হয়। মানবদরদী নাজির আহমদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের সেবা করেন।

১৯৪৩ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি টেনিস খেলার মাঠে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অত্মপ্রত্যয়ী নাজির আহমদ বিবাদ থামাবার জন্য এগিয়ে যান। একজন হিন্দু ছাত্র হঠাৎ তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে দ্রুত মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কবি জসিমউদ্দিন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। হাসপাতালে গিয়ে তিনি সারাক্ষণ নাজির আহমদের বেডের পাশে বসা ছিলেন। সন্ধার দিকে নাজির আহমদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে কবি জসিমউদ্দিন ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। শহীদ নাজির আহমদকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।)

নাজির আহমদের শাহাদাতের পর ঢাকায় ছাত্র সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন সর্বজনাব শামসুল হক, শামসুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ প্রমুখ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অল বেঙল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগের নাম হয় ইস্ট বেঙল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ।

❑ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর অবদান

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী দারুল উলুম, দেওবন্দ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কানপুরে গিয়ে চৌদ্দ বছর শিক্ষকতা করেন। অতপর কানপুর থেকে তিনি থানাভবন নামক স্থানে এসে একটি খানকাহ গড়ে তোলেন।

১৯৪০ সনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করলে দারুল উলুম, দেওবন্দের আলিমগণ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন নেই মনে করে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

মাও. আশরাফ আলী থানবী আলিমদেরকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার আহবান জানান।

১৯৪৩ সনে মাও. আশরাফ আলী থানবী মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর উদাত্ত আহবান প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

দারুল উলুম, দেওবন্দের কয়েকজন আলিম তাঁর আহবানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী ও মুফতী মুহাম্মাদ শফি উসমানী।

মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী ১৯১৯ থেকে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ–এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

খিলাফাত আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলিমগণ কাছাকাছি আসে বিধায় অনেকেই এটিকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেন।

দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলিমদের একটি যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মাও. আবুল কালাম আযাদসহ কংগ্রেসের অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে আলোচনা হয় ঃ মুসলিমগণ কি শর্তসাপেক্ষে না বিনাশর্তে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করবে।

মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিলো ঃ মুসলিমদের অধিকার মেনে নেওয়ার শর্তেই কেবল মুসলিমগণ কংগ্রেসের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারে। তাঁর বক্তব্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বেশ বিব্রতবোধ করতে থাকেন। কিন্তু দূরদর্শী ও স্পষ্টভাষী মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী বলেন, 'আমার এই সহজ সরল ভাষণের মধ্য দিয়ে আমি বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরতে চাই, যাতে মুসলিম স্বার্থ বানচাল করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।'

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনের পর দিল্লীতেই মুসলিমদের আলাদা একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেও মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের সারকথা ছিলো ঃ হিন্দুদের সাথে যুক্ত থেকে মুসলিমগণ স্বকীয় আদর্শ নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না।

১৯৪৫ সনের ২৬শে অকটোবর মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী প্রমুখের আহবানে কলকাতার মুহাম্মাদ আলী পার্কে একটি উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কানপুরের (উত্তরপ্রদেশ) অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব মাও. আযাদ সুবহানী

এই ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী, মাও. মুহাম্মাদ ইবরাহীম (শিয়ালকোট), মাও. আবদুর রউফ দানাপুরী, মাও. আযাদ সুবহানী, মাও. তাহির কাসেমী, মাও. গোলাম মুরশিদ (আলীগড়), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাও. আতহার আলী, মাও. মুছলেহউদ্দিন প্রমুখ।

কলকাতার উলামা সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রধান কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মী মাও. জাফর আহ্মাদ আনছারীর মাধ্যমে একটি বাণী প্রেরন করেন। ঐ বাণীতে তিনি পাকিস্তান অর্জিত হলে সেটিকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[১৩]

অসুস্থ থাকায় মাও. শাব্বির আহ্মাদ উসমানী সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর একটি লিখিত বক্তব্য সম্মেলনে পড়ে শুনানো হয়। এই বক্তব্য শুনে বহুসংখ্যক আলিম নব চেতনায় উদ্দীপিত হন। তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। যাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে রাজি ছিলেন না তাঁরা আলাদা হয়ে যান।

এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নামের একটি নতুন সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যগণের ভোটে মাও. শাব্বির আহ্মাদ উসমানী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত উলামা সম্মেলনের দুই মাস পর ১৯৪৫ সনের ২৬শে ডিসেম্বর দেওবন্দে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মাও. শাব্বির আহ্মাদ উসমানী বলেন, 'শারীরিক অসুস্থতার দরুণ আমি জাতির সমস্যাবলী থেকে দীর্ঘকাল এক রকম প্রবাসী জীবন যাপন করেছি। কিন্তু মুসলিমগণ বর্তমানে যে নানান সংকট সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে, তার শেষ পরিণতি এতোই গুরুতর যে তা আমাকে এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে এসেছে। খিলাফাত আন্দোলনের পর আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রায় দূরেই সরে গিয়েছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে রক্ত দেওয়াকে আমি গৌরবের বিষয় বলে মনে করবো।'

---

১৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা, পৃষ্ঠা– ৭১

জমিয়ত গঠন করে তিনি গোটা উপমহাদেশে ব্যাপক সফর করেন।

১৯৪৬ সনের ২৫–২৭শে জানুয়ারি লাহোরের ইসলামিয়া কলেজে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে মাও. শাব্বির আহমদ উসমানী এক জ্ঞানগর্ভ ও প্রেরণাদায়ক ভাষণ দেন যা ছিলো জমিয়তের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন।

মাও. আকরাম খাঁ, মাও. আবদুল্লাহিল বাকি এবং মাও. আবদুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব থেকেই মুসলিম লীগে ছিলেন। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সমর্থন না থাকায় 'মুসলিম লীগে আলিম নেই' এমন একটি সূক্ষ্ম প্রচারনা চলছিলো।

মাও. শাব্বির আহমাদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাও. জাফর আহমাদ উসমানী, মাও. জাফর আহমাদ আনছারী, মাও. ইহতিশামুল হক থানবী, মাও. সাইয়েদ সুলাইমান নদবী, মাও. আতহার আলী (সিলেটে জন্ম, কর্মস্থল কিশোরগঞ্জ ও মোমেনশাহী), মাও. শামসুল হক ফরিদপুরী, মাও. মুছলেহউদ্দিন (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম, কর্মস্থল কিশোরগঞ্জ), ফুরফুরার পীর সাহেব মাও. আবদুল হাই ছিদ্দিকী, ছারছিনার পীর সাহেব মাও. নেছারউদ্দিন আহমাদ, মুফতী দীন মুহাম্মাদ খান (ঢাকা), মাও. হাজী শারীয়াতুল্লাহর বংশধর মাও. আবু খালিদ রাশিদুদ্দিন আহমদ (বাদশা মিয়া), মাও. সিদ্দিক আহমদ (চট্টগ্রাম), মাও. আবদুল আলী (ফরিদপুর), মাও. বজলুর রহমান (দয়াপুর) প্রমুখ আলিম পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে মাঠে নামার পর মুসলিমদের মাঝে এক অভূতপূর্ব গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। অচিরেই মুসলিমদের মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়ে ওঠে যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তোলে। সেই সময়ের মুসলিমদের চিন্তাচেতনার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠেছে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বক্তব্যে।

তিনি বলেন, "অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে,

ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে। এই সময় আমাদের বক্তৃতার ধারাও বদলে গেছে। অনেক সময় হিন্দু বন্ধুদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা এ নিয়ে আলোচনা হত। কিছুতেই তারা বুঝতে চাইত না। ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্রেনে, স্টিমারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত। সময় সময় এমন পর্যায়ে আসত যে, মুখ থেকে হাতের ব্যবহার হবার উপক্রম হয়ে উঠত। এখন আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ নাই। পাকিস্তান আনতে হবে এই একটাই শ্লোগান সকল জায়গায়।"[১৪]

(উল্লেখ্য, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর মাও. আতহার আলী ও মাও. মুছলেহউদ্দিন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম–এর যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।)

❑ ১৯৪৬ সনের কেবিনেট মিশন প্ল্যান ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের জনবল ও ধনবল ব্যাপক হারে ক্ষয় হয়। অতো দূর থেকে ভারতশাসন করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, গুপ্ত সংস্থাগুলোর সশস্ত্র হামলা, জাপানের সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বাধীন 'আযাদ হিন্দ ফৌজ' কর্তৃক ভারতের পূর্ব সীমান্তে সামরিক চাপ, আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার দেওয়ার জন্য আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রুজেভেল্টের পরামর্শ, হিন্দু মুসলিম দাংগার বিস্তৃতি– সব মিলিয়ে হিসাবনিকাশ করে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশের আযাদী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও লর্ড এ.ভি. আলেকজান্ডার সমন্বয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন আসে ভারতে। শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্য পাঠানো হয়েছিলো এই মিশন।

কেবিনেট মিশন গোটা দেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠনের প্রস্তাব দেয়।

কেবিনেট মিশন আরো প্রস্তাব দেয় যে উপমহাদেশের প্রদেশগুলোকে

---

[১৪] ১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা– ৩৬

গ্রুপ–এ, গ্রুপ–বি ও গ্রুপ–সি তে বিভক্ত করা হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার প্রদেশ ও উড়িশা প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ–এ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধ প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ–বি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা প্রদেশ ও আসাম প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে গ্রুপ–সি।
প্রস্তাবে আরো বলা হয়, ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রে একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' (Interim Government) থাকবে।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবকে মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জনের পথে একধাপ অগ্রগতি গণ্য করে তা মেনে নেয়।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনসহ কেবিনেট মিশনের পুরো পরিকল্পনাই গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরির লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব ছাড়া কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার আর কিছুই গ্রহণ করেনি।
এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকারের নৈতিক দায়িত্ব ছিলো অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আহবান জানানো। কিন্তু কংগ্রেসের ভয়ে বৃটিশ সরকার তা করেনি। ফলে ১৯৪৬ সনের ২৯শে জুলাই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন প্ল্যানের প্রতি প্রদত্ত সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।
ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলিম দাংগা চরম আকার ধারণ করে।
দেশভাগ ক্রমশ:ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠছিলো। এতে হিন্দুদের উগ্র অংশটি মারমুখো হয়ে ওঠে। তারা ভাবলো, 'ভারত মাতা'-কে ভাগ করার আন্দোলন ঠেকাতে হলে মুসলিমদেরকে নির্মূল করতে হবে। এই চিন্তারই ফসল ১৯৪৬ সনের দিল্লী রায়ট। এরপর ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগাস্ট বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতায় রায়ট শুরু হয়। এই রায়টে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয় এবং নিহতদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাই ছিলো বেশি।
কলকাতা রায়টের ভয়বহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ

বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়।"[১৫]

এইদিকে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নাটকীয়ভাবে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহবান জানান।

১৯৪৬ সনের ২রা সেপ্টেম্বর সরকার গঠনের দিন ধার্য হয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ১লা সেপ্টেম্বর 'কালোদিবস' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিভিন্ন স্থানে দাংগা হাংগামা ছড়িয়ে পড়ে।

লর্ড ওয়াভেল ভীত হয়ে পড়েন। তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে শামিল হওয়ার আহবান জানান। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সনের ১৬ই অকটোবর মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়। ফলে সরকার 'রিশাফল' করতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বলা হতো ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। ভাইসরয় ছিলেন এর প্রেসিডেন্ট।

প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদায় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

স্বরাষ্ট্র দফতর পান সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল। শিখনেতা বলদেব সিং প্রতিরক্ষা দফতর, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি শিক্ষা দফতর, আসফ আলী রেলওয়ে ও পরিবহন দফতর, সিডিউলড্ কাস্ট নেতা জগজীবন রাম শ্রম দফতর, রাজেন্দ্র প্রসাদ খাদ্য ও কৃষি দফতর, মি.এইচ. ভবা খনি, পূর্ত দফতর, জন মাথাই শিল্প ও সাপ্লাই দফতর, লিয়াকত আলী খান (মুসলিম লীগ) অর্থ দফতর, আবদুর রব নিশতার (মুসলিম লীগ) ডাক ও বিমান দফতর, ইবরাহীম ইসমাঈল চুন্দ্রিগড় (মুসলিম লীগ) বাণিজ্য দফতর,

---

১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা– ৬৬

রাজা গজনফর আলী খান (মুসলিম লীগ) স্বাস্থ্য দফতর এবং মুসলিম লীগ মনোনীত সিডিউল্ড কাস্ট নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল আইন দফতর লাভ করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিলো খুবই অস্বস্তিকর একটি বিষয়। শাসনকার্য পরিচালনাকালে প্রতিটি বিষয়ে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ হতেই থাকে। ফলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

১৯৪৬ সনের শেষ ভাগে বিহারে মুসলিমদের ওপর উগ্র হিন্দুদের হামলা শুরু হয়। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা নিহতের সংখ্যা ৭,৫০০ থেকে ১০,০০০-এর মধ্যে বলে রিপোর্ট করে। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রদেশ এবং পাঞ্জাব প্রদেশেও হাজার হাজার মুসলিম প্রাণ হারায়। আহত হয় বিপুল সংখ্যক মানুষ। হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়। লুন্ঠিত হয় সম্পদ। অগণিত মুসলিম নারীর ইয্যত লুন্ঠন করা হয়।

(উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সনে দেশ ভাগ হলে উগ্র হিন্দুদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বিহার প্রদেশ থেকে কয়েক লক্ষ মুসলিম পূর্ব বাংলায় হিজরাত করে আসে। এরাই বিহারী নামে অভিহিত হয়।)

❑ অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠন প্রয়াস

নিখিল বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মাও. আকরম খাঁ ঘোষণা করেছিলেন 'আমার রক্তের ওপর দিয়েই বাংলা ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাকে ভাগ করতে দেবো না। আর সমস্ত বাংলাই পাকিস্তানে যাবে।'

বাংলা আইন পরিষদে মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন অনুরূপ দৃষ্টিভংগি পোষণ করতেন।

অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্থানের (ভারতের) অংশ না বানিয়ে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিলেন বাংলার চিফ মিনিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ব্যারিস্টার শরৎ চন্দ্র বসু (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বড়ো ভাই), কিরণ শংকর রায় (তখনকার বাংলার আইন সভার

কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা), সত্য রঞ্জন বকশি (শরৎ চন্দ্র বসুর একান্ত সচিব), আবুল হাশিম (প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক), ফজলুর রহমান (রাজস্ব মন্ত্রী), মুহাম্মাদ আলী চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী) প্রমুখ। আর অবিভক্ত বাংলা বলে বুঝানো হতো বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম এবং বিহারের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পুর্ণিয়া জিলা সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলকে। কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর আপত্তি নেই বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এবং দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভারতীয় ভাইস চান্সলার (১৯০৬-১৯১৪) আশুতোষ মুখার্জির পুত্র ছিলেন ব্যারিস্টার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ১৯৪৪ সনে তিনি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম দিকে ভারত ভাগের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৪৬ সনের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার পর তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

১৯৪৬ সনে তিনি বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার দাবি জানান। ১৯৪৭ সনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎ চন্দ্র বসু অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের যেই প্রচেষ্টা চালান তিনি তারও বিরোধিতা করেন।

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সম্মতি হাছিলের জন্য কলকাতা থেকে দিল্লীতে ছুটে গিয়েছিলেন শরৎ চন্দ্র বসু। তিনি মহাত্মা গান্ধি এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথে এই বিষয়ে আলাপ করেন। তাঁরা নিজেরা কোন মত ব্যক্ত না করে শরৎ বাবুকে সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে সাক্ষাত করতে বলেন।

"শরৎ বাবু কংগ্রেসের নেতাদের সাথে দেখা করতে যেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ, সরদার ভল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছিলেন, শরৎ বাবু, পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই"।[১৬]

---

[১৬] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা– ৭৪

❑ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান

ভারত বিভাগ ঠেকানো যাচ্ছে না বুঝতে পেরে 'অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা'র অন্যতম নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৪৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি মারফত 'বংগ ভংগে'র দাবি তোলেন।

১৯৪৭ সনের মার্চ মাসে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য কৃপালনী 'বংগ ভংগে'র অর্থাৎ বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার দাবি সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন।

অথচ এই কংগ্রেসই ৪২ বছর আগে বাংলাকে ভাগ করে আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো।

১৯৪৭ সনের মার্চ মাসের শেষের দিকে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের স্থলে ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

গোটা ভারত তখন সাম্প্রদায়িক দাংগায় ক্ষত-বিক্ষত।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করেন এবং ঠান্ডা মাথায় গোটা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি অনুভব করলেন, অবিলম্বে দেশভাগ হওয়া প্রয়োজন।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে বুঝাতে সক্ষম হন যে কেবিনেট মিশন প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করবে এবং কেন্দ্র হবে খুবই দুর্বল। অথচ উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব কোণে দুইটি ক্ষুদ্র এলাকা অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগকে ছেড়ে দিলে অবশিষ্ট বিশাল ভারতের ওপর দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস শক্তিশালী কেন্দ্রসহ একচ্ছত্র শাসন কায়েম করতে পারবে। পন্ডিত জওহরলাল নেহরুও এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে ভারত ভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[১৭]

মহাত্মা গান্ধি কিছুতেই দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিলেন না। এমন কি দেশভাগ ঠেকাবার জন্য তিনি মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁর এই চিন্তার তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে মহাত্মা গান্ধি অনিচ্ছা সত্বেও

---

[১৭] ১৭. ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পৃষ্ঠা-১৬১

ভারতবিভক্তির প্রস্তাব মেনে নেন। অথচ কিছুদিন আগেও তিনি মাও. আবুল কালাম আযাদকে বলেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়েই কেবল কংগ্রেস ভারতবিভক্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এইদিকে বৃটিশ সরকারের সাথে পরামর্শ করে ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতবিভক্তির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এই পরিকল্পনা ঘোষিত হয় ১৯৪৭ সনের ৩রা জুন। এইজন্য এটিকে ৩রা জুন পরিকল্পনাও বলা হয়।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, বর্তমান গণপরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে। তবে এই গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান সেই সব অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে না যেই সব অঞ্চল তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, যেইসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বর্তমান গণপরিষদে অংশ গ্রহণ করবে না সেইসব অঞ্চলের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হবে।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইন পরিষদ সদস্যগণ স্থির করবেন তাঁরা ভারতে যোগদান করবেন, না পাকিস্তানে।

(উল্লেখ্য, তখন বেলুচিস্তানে প্রাদেশিক আইন পরিষদ ছিলো না।)

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জিলাগুলোর সদস্যগণ স্থির করবেন সেই সব জিলা ভারতে, না পাকিস্তানে যোগদান করবে।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং আসামের সিলেট জিলা ভারত না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা গণভোটের মাধ্যমে স্থির হবে।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য 'বাউন্ডারি কমিশন' গঠন করা হবে।

এই পরিকল্পনায় বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে 'দি ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিল' পেশ করা হবে।

লুই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত গণভোটে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিলেট জিলা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দেয়। পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলের জিলাগুলো পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে

এবং পূর্বাঞ্চলের জিলাগুলো ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দেয়। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জিলাগুলো পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে এবং পশ্চিমাঞ্চলের জিলাগুলো ভারতে যোগদানের পক্ষে ভোট দেয়।

☐ দি ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাক্ট ১৯৪৭

১৯৪৭ সনের ১৮ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলীর উদ্যোগে বৃটিশ পার্লামেন্ট 'দি ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাকট' পাশ করে।

এই আইনে বলা হয়, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত (বর্তমান খাইবার-পাখতুনখোয়া) প্রদেশ, সিন্ধ প্রদেশ, বেলুচিস্তান প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশ, পূর্ব বাংলা প্রদেশ এবং সিলেট জিলার মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত হবে ডোমিনিয়ন অব পাকিস্তান। বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ), মধ্য প্রদেশ, বিহার প্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশ, পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, সিলেটের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো বাদে আসাম প্রদেশ, দিল্লী, আজমীর, মেরওয়ার এবং কুর্গ নিয়ে গঠিত হবে ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া।

এই আইনে বলা হয়, পাকিস্তান ও ভারতের গণপরিষদ নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করবে এবং নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ দুইটি স্ব স্ব দেশের আইন পরিষদ রূপেও কাজ করবে।

এই আইনে বলা হয়, দেশীয় রাজ্যগুলো স্বাধীন থাকবে অথবা নিজের ইচ্ছা মতো ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগদান করবে।

১৯৪৭ সনের ১৮ই জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে এই আইন পাস হওয়ার পর ১৯৪৭ সনের ২৬শে জুলাই 'গেজেট অব ইন্ডিয়া'-তে একটি নোটিশ প্রকাশ করে পাকিস্তানের জন্য পৃথক একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। (উল্লেখ্য, এই গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৬৯, পরে তাতে আরো দশজন যোগ করে সংখ্যা ৭৯ জনে উন্নীত করা হয়।)

দি ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাকট ১৯৪৭ অনুযায়ী ১৯৪৭ সনের ১৪ই অগাস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং ১৫ই অগাস্ট স্বাধীন হিন্দুস্থান বা ভারত রাষ্ট্র পত্তন করা হয়।

নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন লিয়াকত আলী খান।

নবগঠিত হিন্দুস্থান বা ভারত রাষ্ট্রের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হন লর্ড লুই

মাউন্টব্যাটেন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। দেশভাগ হওয়ার পর ভারত থেকে ৮২,২৬,০০০ জন মুসলিম হিজরাত করে পাকিস্তানে আসেন। আর পাকিস্তান থেকে ভারতে যান ৭২,৪৯,০০০ জন অমুসলিম।

❑ ১৯৪৭ সনের বাউন্ডারি কমিশন

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশের বিভক্তি ঠেকাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত ছিলো। তাই প্রদেশ দুইটি ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশ ভাগ করে সীমানা নির্ধারনের জন্য বৃটিশ সরকার স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে দুইটি বাউন্ডারি কমিশন গঠন করে ঃ পাঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশন এবং বেঙল বাউন্ডারি কমিশন।

পাঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন বিচারপতি মেহের চাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজ সিং। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বিচারপতি দীন মুহাম্মাদ ও বিচারপতি মুহাম্মাদ মুনীর।

বেঙল বাউন্ডারি কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন বিচারপতি সি.সি. বিশ্বাস ও বিচারপতি বি.কে. মুখার্জি। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন বিচারপতি আবু ছালিহ মুহাম্মাদ ও বিচারপতি মুহাম্মাদ আকরাম।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো মি. র‍্যাডক্লিফের হাতে।

বাউন্ডারি কমিশনও মুসলিমদের প্রতি দারুণ অবিচার করে।

পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জিলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। ভারতের সুবিধার দিকে তাকিয়ে এই জিলাটি ভারতকেই দিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বাঞ্চলেও অনুরূপ অবিচার করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা মুর্শিদাবাদ ভারতকে দিয়ে দেওয়া হয়। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা মালদহকে ভাগ করে মালদহ শহরসহ বিরাট অংশ ভারতকে দিয়ে দেওয়া

হয়। মালদহ জিলার কেবল নওয়াবগঞ্জ থানাটি দেওয়া হয় পাকিস্তানকে। আসাম তো গেলোই। সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ছিলো। এই মহকুমাটিও ভারতকে দিয়ে দেওয়া হয়।

অতি দ্রুততার সাথে এই ভাগবাটোয়ারা করতে গিয়ে বহুক্ষেত্রে অবিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোথাও একটি গ্রামকে দুইভাগ করা হয়েছে, কোথাও একটি বাড়িকেও দুইভাগ করা হয়েছে। এতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সীমান্তে স্থায়ী কলহের বীজ রোপিত হয়েছে।

১৯৪৭ সনের ১৭ই অগাস্ট বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়। বাউন্ডারি কমিশনের মাধ্যমে ভারতের মুসলিমদের ওপর বড়ো রকমের আঘাত হানা হয়।

☐ জম্মু-কাশমির পেলো না পাকিস্তান

দূর অতীত থেকে শুরু করে আঠারো শতক পর্যন্ত কাশমির মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়।

১৮১৯ সনে পাঞ্জাবের শিখরাষ্ট্র প্রধান রণজিৎ সিং দুররানী বংশীয় মুসলিম শাসকদের হাত থেকে কাশমির কেড়ে নেন। গুলাব সিং নামক একজন প্রশাসকের সার্ভিসে সন্তুষ্ট হয়ে রণজিৎ সিং ১৮২০ সনে তাঁকে জম্মু অঞ্চলের রাজা বানান।

১৮৪৫-১৮৪৬ সনে ইংরেজদের সাথে শিখদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের সময় জম্মুর রাজা গুলাব সিং নিরপেক্ষ থাকেন। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ বিজয়ী হয়। যুদ্ধের পর ইংরেজগণ ৭৫ লাখ রূপির বিনিময়ে জম্মুর রাজা গুলাব সিং-এর হাতে কাশমির তুলে দেয়।

গুলাব সিং-এর পর যথাক্রমে রণবীর সিং, প্রতাপ সিং এবং হরি সিং জম্মু-কাশমির রাজ্যের মহারাজা হন।

ইংরেজ শাসনকালে জম্মু-কাশমির একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসেবে অবস্থান করে।

১৯৪৭ সন।

দেশভাগ আসন্ন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্বপ্নের অংশ ছিলো জম্মু-কাশমির। Pakistan শব্দটির K অক্ষরটি 'কাশ্মির' শব্দের প্রতিনিধিত্ব করতো।

তখন জম্মু-কাশমিরের জনসংখ্যার ৭৭ ভাগ ছিলো মুসলিম। তারা পাকিস্তানে যোগদানের জন্যই উদগ্রিব ছিলো।

মহারাজা হরি সিং চাচ্ছিলেন, জম্মু-কাশমির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করবে।

কিন্তু কাশমির ছিলো দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নিকট অতি লোভনীয় একটি স্থান। তদুপরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন কাশমিরের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি চাচ্ছিলেন, যেই ভাবেই হোক কাশমিরকে ভারতভুক্ত করতেই হবে।

নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় মহারাজার ওপর। এই চাপ তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি।

১৯৪৭ সনের ২৭শে অকটোবর মহারাজা হরি সিং The Instrument of Accession to India নামক দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।

অতি দ্রুততার সাথে ভারতীয় সৈন্যরা গোটা জম্মু-কাশমির ছেয়ে ফেলে।

এইভাবে কেড়ে নেওয়া হয় জম্মু-কাশমির।

শতকরা ৭৭ জন মুসলিমঅধ্যুষিত রাজ্য হওয়া সত্বেও জম্মু-কাশমির পেলো না পাকিস্তান।

--o--

উপমহাদেশের
অতীত রাজনীতির
খণ্ড চিত্র

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

দি ইন্ডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা